২ এপ্রিল ২০০৮ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ উপন্যাস
(প্রথমাংশ)
ঝুনঝুন প্রাসাদের ছায়ামূর্তি

শুরু হল শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের
দমফাটা হাসির কমিক্‌স
কলকাতার হালচাল

দু'টি জমজমাট গল্প

কিং খানের সেনাবাহিনী

নতুন তারকা শ্রীবৎস

মায়াবিনী মায়র্কা

অপ্রতিরোধ্য মাহি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বরুন রেজ
স্ক্যান করেছেন - বরুন রেজ
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

LOTUS
HERBALS
SAFE SUN
just for kids!
NO TAN. NO BURNS. NO DAMAGE.
ENRICHED WITH
BOTANICAL
EXTRACTS
LOTUS
HERBALS
SAFE SUN
kids
SUN BLOCK CREAM
Sensitive Skin Formula
Sweat & Water Proof, Non Greasy
SPF 25
All skin types
KIDS Sunblock
SPF 25
suitable for sensitive skin
sweat & water-proof
non-greasy finish
www.lotusherbals.com

আয়ুর্বেদ মতে

ঠাণ্ডা-গরমে - ঋতু পরিবর্তনে

সর্দি কাশির উপশমে

দুলালের® তালমিছরি

আজও সত্যিই ধন্বন্তরী।

3D হলোগ্রাম স্টিকারটি দেখে নেবেন

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট।

আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান - দারুণ কাজ দেবে।

PRASA-07

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের® তালমিছরি

সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনি: সত্যজিৎ রায় • ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

এবার কাণ্ড কেদারনাথে ৭৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ১০০.০০
দার্জিলিং জমজমাট ১০০.০০
নেপোলিয়নের চিঠি ৭৫.০০
রবার্টসনের রুবি ১০০.০০

প্রোফেসর শঙ্কুর রোমাঞ্চকর কমিক্স

কাহিনি: সত্যজিৎ রায় • ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

একশৃঙ্গ অভিযান ৭০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ এফ ও ৬০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু—চী-চিং • আশ্চর্য পুতুল ৬০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু—হাড় • রোবু ৭০.০০
মরুরহস্য • শঙ্কু ও আদিম মানুষ ৫০.০০
মানরো দ্বীপ • আশ্চর্জন্তু ৭৫.০০
শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান ৪০.০০

টেনিদার কমিক্স

পটলডাঙার টেনিদা

কাহিনি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় • ছবি: অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী

ঝাউ-বাংলোর রহস্য ৬০.০০
টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক-ইয়েতি ৭৫.০০

ময়ূখ চৌধুরী
অ্যাডভেঞ্চার
কমিক্স
৪০.০০

নীল ও জগাদার অ্যাডভেঞ্চার
গোখরো দ্বীপের ডাকিনী
৬০.০০
কাহিনি ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

সন্তু-কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স
ভয়ংকর সুন্দর
৬০.০০
কাহিনি: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: বিজন কর্মকার

আনন্দ-র বই পাওয়া যায়

অক্সফোর্ড: পার্ক স্ট্রিট, অক্সফোর্ড জুনিয়র
প্যান্টালুন্স: ক্যামাক স্ট্রিট, কাঁকুড়গাছি, গড়িয়াহাট, সাউথ সিটি
ই-মল: চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
বিগবাজার: ভি আই পি রোড, বাগুইহাটি, বাঘাযতীন, হাইল্যান্ড পার্ক, লি রোড, হাওড়া, হলদিয়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান, শিলিগুড়ি
ক্রস ওয়ার্ড: এলগিন রোড, সেক্টর ফাইভ-সল্ট লেক, সাউথ সিটি
স্টার মার্ক: লর্ড সিনহা রোড, সিটি সেন্টার, সাউথ সিটি

গিফ্‌ট কুপন

প্রিয়জনকে আনন্দ উপহার

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফ্‌ট কুপন পাওয়া যাবে আমাদের সব বিপণনকেন্দ্র থেকে।

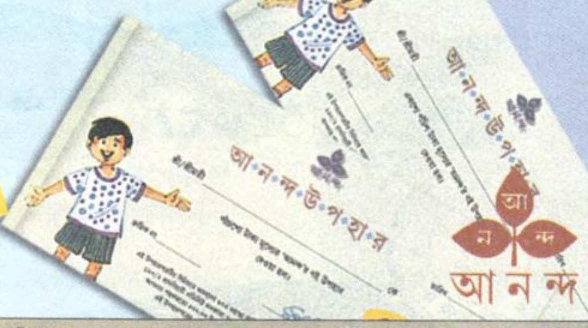

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

আনন্দমেলা

৩৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২ এপ্রিল ২০০৮ ১৯ চৈত্র ১৪১৪

শুরু হল দমফাটা হাসির কমিক্‌স ১১

কলকাতার হালচাল

কাহিনি: শিবরাম চক্রবর্তী

অসমের জঙ্গলে কাঠের কারবার হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনের। নাম 'বর্ধন অ্যান্ড কোম্পানি'। ওদের কলকাতা ব্রাঞ্চের কর্মী পানু চিঠি লিখেছে, কলকাতার লোকেরা নাকি মিশুকে নয় একেবারেই। সাতদিন পরে ওরা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামল কথাটা সত্যি কিনা যাচাই করতে। স্টেশনে পানুর আসার কথা, কিন্তু তার আর দেখা নেই। এর পর কী ঘটল?

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ৩৬

ঝুনঝুন প্রাসাদের ছায়ামূর্তি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে অনিকেত আর পার্থ গেল রাজস্থান বেড়াতে। চিতোরগড়ে পৌঁছে ওরা কোথায় থাকবে যখন ভাবছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হল ওদের। তিনি ওদের বললেন, তিনি একা থাকেন। ওরা ইচ্ছে করলে তাঁর বাড়িতেও থাকতে পারে। তিনি থাকেন দুর্গের ভিতরে। ওরা রাজি হয়ে গেল। ওই বৃদ্ধ লোকটি কে? কী ঘটল তারপর?

খেলাধুলো

নতুন তারকা শ্রীবৎস ৬৩ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

অপ্রতিরোধ্য মাহি ৬৪ শুভম ঘোষ

কিং খানের সৈন্যবাহিনী ৬৫ পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

বেড়ানো

মায়াবিনী মায়র্কা

৩৫

অনিন্দ্যকান্তি মজুমদার

বালেরিক দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপের নাম মায়র্কা। বাঁ দিকে সমুদ্রের নীল জল, ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে। জল বেশ ভারী, অনায়াসে ভেসে থাকা যায়। নানারঙের মাছ ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলে। প্রবাল নেই, আছে নানারঙের উদ্ভিদ। এখানকার পালমা শহরে হয় ষাঁড়ের লড়াই। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনায় ভরা এই লড়াই দেখতে ছুটে যান পর্যটকরা।

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৬

পাঠকের পাতা ৭

আশ্চর্য পৃথিবী ১০

কুইজ ২৬

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো, হাসছি দ্যাখো ৬০

অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৬১

নানারঙের রামধনু ৬২

গল্প

নিউস্টাইনের দেশে

জয়িতা চাকলাদার ২৮

ভূত এসেছিল

তন্ময় দত্ত ৫৪

প্রচ্ছদ: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

ভাল লেগেছে। এ ছাড়া 'রাপ্পা রায়...'-এর মতো কিছু অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হলে খুব ভাল হয়।
আমি এবার খুবই দুঃখ পেলাম 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগটি না পেয়ে। আমি বড় হয়ে বিজ্ঞানী হতে চাই, তাই বিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে লেখা পড়তে খুব ভালবাসি। আমার অনুরোধ এই বিভাগ যেন প্রতি সংখ্যাতেই ছাপা হয়।

শৌভিক গিরি
অষ্টম শ্রেণি, তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল তমলুক

ভাল লেগেছে ১০০ জোক্স

আমার মজাদার ১০০ জোক্স খুব ভাল লেগেছে। 'দলবেঁধে পিকনিক' ও 'বাগদেবীর মুখোমুখি' গল্পগুলোও আমার খুব ভাল লেগেছে। প্রতি সংখ্যায় 'অমিল খোঁজো তফাত বোঝো' দিলে ভাল হয়।

আরাত্রিকা বসু
তৃতীয় শ্রেণি, সীতানাথ শিশু শিক্ষামন্দির বিদ্যালয়

জোক্স পড়ে হাসি পায়নি

আমি 'আনন্দমেলা'র একজন নিয়মিত পাঠক। এবারের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'মজাদার ১০০ জোক্স'-এর দু'-একটি বাদে কোনও জোক্সেই হাসি পায়নি। 'সেই কালো ব্যাগটি' গল্পটি খুবই

ভাল লেগেছে মার্চ সংখ্যা

আমি 'আনন্দমেলা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। মার্চ সংখ্যা খুব জমজমাট হয়েছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'ধূর্জটিবাবুর প্ল্যানচেট'। 'ভূতের মেলায়' গল্পটার শেষে সাসপেন্স থেকে যাওয়ায় একদম ভাল লাগেনি। আমার মনে হয় আনন্দমেলা দিন-দিন ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে। পাতায়-পাতায় এত বিজ্ঞাপন না দিয়ে নতুন কিছু দেওয়া হোক। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' প্রায়ই থাকছে না! আমার একান্ত অনুরোধ, 'পাঠকের পাতা'র প্রতিযোগিতা যেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে।

সনম পারভিন
অষ্টম শ্রেণি, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুল, বর্ধমান

মার্চ সংখ্যায় ১০টি ভূতের গল্পই আমার খুব ভাল লেগেছে। তবে শিশির বিশ্বাসের 'ভূতের মেলায়' গল্পটি অত ভাল লাগেনি। মাঝে-মাঝে নামী লেখকের ভূতের গল্প দিলে ভাল লাগবে।

অরিত্র চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন সেন্টিনারি প্রাইমারি স্কুল, বরানগর

ভাল লেগেছে সারান্ডার ভূতবাংলো

আমি 'আনন্দমেলা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আমার 'সারান্ডার ভূতবাংলো'র বিবরণ খুব ভাল লেগেছে। মাঝে-মাঝে এরকম ভৌতিক ঘটনার কথা লিখলে খুব ভাল লাগবে। অন্যান্য গল্পগুলি ভাল লেগেছে। কিন্তু 'হাসছি দ্যাখো'তে মোটেই হাসি পাচ্ছে না। 'হাসছি দ্যাখো'তে দু' নম্বর জোক্সটা ফেব্রুয়ারি সংখ্যার ২৬ নং জোক্সটার মতোই। একই রকম জোক্স না দিয়ে আলাদা-আলাদা জোক্স দিলে ভাল হয়।

সোহিনী সোম
অষ্টম শ্রেণি, বিধাননগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দুর্গাপুর

আরও যাদের মার্চ সংখ্যা ভাল লেগেছে:
অংকৃত ঘোষ *অষ্টম শ্রেণি, বারাসাত, চন্দননগর;* **রাজীব গরাই** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া;* **স্বাগতা সাউ** *দশম শ্রেণি, শিবপুর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল;* **সৌরভ সরকার** *ষষ্ঠ শ্রেণি, বালিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়;* **সাত্যকি বোস** *পঞ্চম শ্রেণি, টাকি বয়েজ় স্কুল;* **দেবমাল্য ঘোষ** *পঞ্চম শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল;* **সপ্তাংশু সরকার** *অষ্টম শ্রেণি, ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়;* **অভিজিৎ দলুই** *অষ্টম শ্রেণি, নারায়ণ দাস বাঙুর মেমোরিয়াল মালটিপারপাস গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুল;* **প্রতিম রায়** *সপ্তম শ্রেণি, রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়;* **প্রীতম যশ** *সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ;* **সৌমী বোস** *পঞ্চম শ্রেণি, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়,* **দিবাকর কীর্তনিয়া** *দ্বাদশ শ্রেণি, মালদহ ইউসিবি বিদ্যালয়,* **পলাশ রজক** *সপ্তম শ্রেণি, তিলুড়ি কৃপাময়ী হাই স্কুল;* **আফরোজ় নাসরিন** *বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।*

পত্রিকা কেমন লাগছে, তা আমাদের জানাও এই ঠিকানায়:
আনন্দমেলা, ডাকবাক্স বিভাগ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেল: anandamela@abp.in

বাংলায় কম্পিউটারের বই
কৌশিক দত্ত ও সোমা রায়চৌধুরীর
প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১৫০
অ্যাডোব ফটোশপ ১৫০ ইন্টারনেট ৭৫
পেজমেকার ৭৫ কোরেল ড্র ১২৫
ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং -ট্যালি ১২৫
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ১২৫ এক্সেল ১২৫
অ্যাকসেস ১২৫ পাওয়ারপয়েন্ট ৮০
সহজে শেখো কম্পিউটার (১,২,৩,৪) ২০০
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নির্দেশিত সিলেবাস অনুসারে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য রচিত
কম্পিউটার প্রয়োগ (১,২,৩) ৫০, ৭০, ৭০
অঞ্জলি প্রকাশনী
'বিদ্যাসাগর টাওয়ার', শপ ১৬ (দোতলা)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন: ৯৮৩৬২৫৮৩৮০/৯৪৩৩৪২৮০১৩
E-mail: anjaliprokashani@hotmail.com / @yahoo.co.in

দোলের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

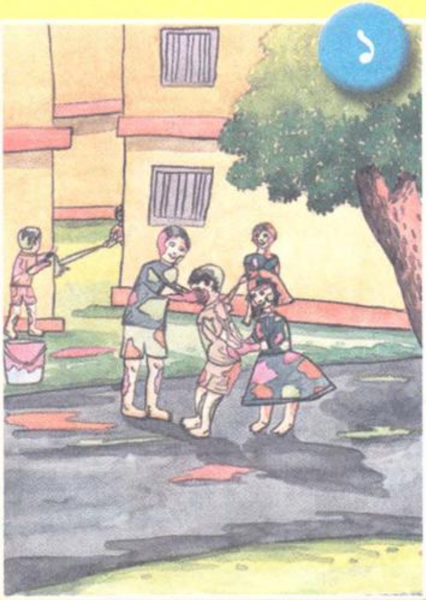

শুভ্রদীপ গুপ্ত
চতুর্থ শ্রেণি
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পাঠশালা
হুগলি

মধুরিমা দাস
ষষ্ঠ শ্রেণি
ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাই স্কুল
কলকাতা

পা ঠ কে **র** পা তা

এবারের প্রতিযোগিতা

বাংলা নববর্ষের দিন সকালে উঠে তোমার হঠাৎ ইচ্ছে করল কোথাও হারিয়ে যেতে। কোথায় যাবে তুমি? সঙ্গে কী-কী নিয়ে যাবে? লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে। যারা ক্লাস ফোর থেকে এইটে পড়ো, তারাই লিখে পাঠাও ২০ এপ্রিলের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা পরবর্তী সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। এসব না উল্লেখ করলে কিন্তু তোমাদের লেখা ছাপায় আমাদের অসুবিধে হবে।

ঠিকানা: পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

সুচয়ন বিশ্বাস
পঞ্চম শ্রেণি, বেথুয়াডহরি জে সি এম হাই স্কুল, নদিয়া

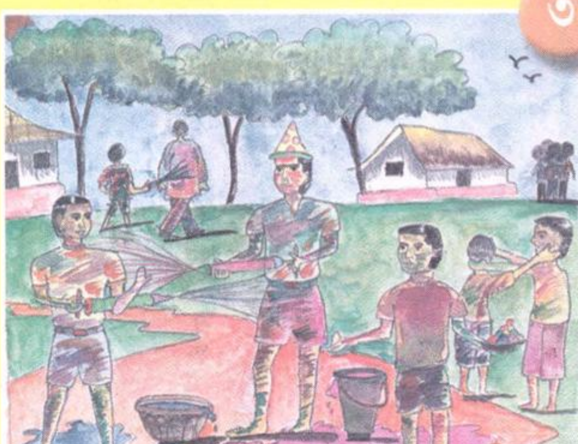

আরও যারা ভাল এঁকেছ

শ্রেয়া ঘোষ, *অষ্টম শ্রেণি, দেবীশ্বরী বিদ্যানিকেতন, হুগলি*

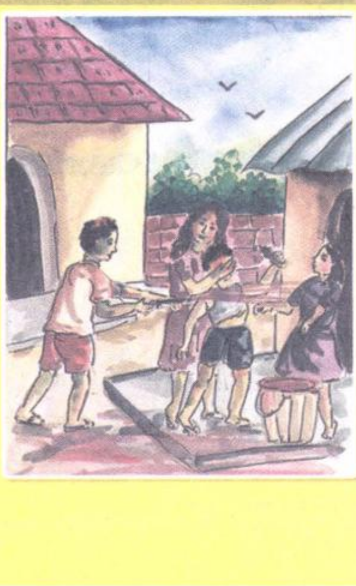

মৃন্ময় মহলদার, *অষ্টম শ্রেণি, কে টি পি পি হাই স্কুল*

অর্ক মণ্ডল, *চতুর্থ শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, আইআইটি, খড়্গপুর*

THIS PRODUCT IS NOT AN INFANT MILK SUBSTIT UTE OR INFANT FOOD FOR LESS THAN 2 YEARS OLD.
JUNIOR HORLICKS 1-2-3* IS A NUTRITION SUPPLEMENT WHICH AS PART OF BALANCED DIET HELPS MEET YOUR CHILD'S NUTRITIONAL REQUIREMENTS.

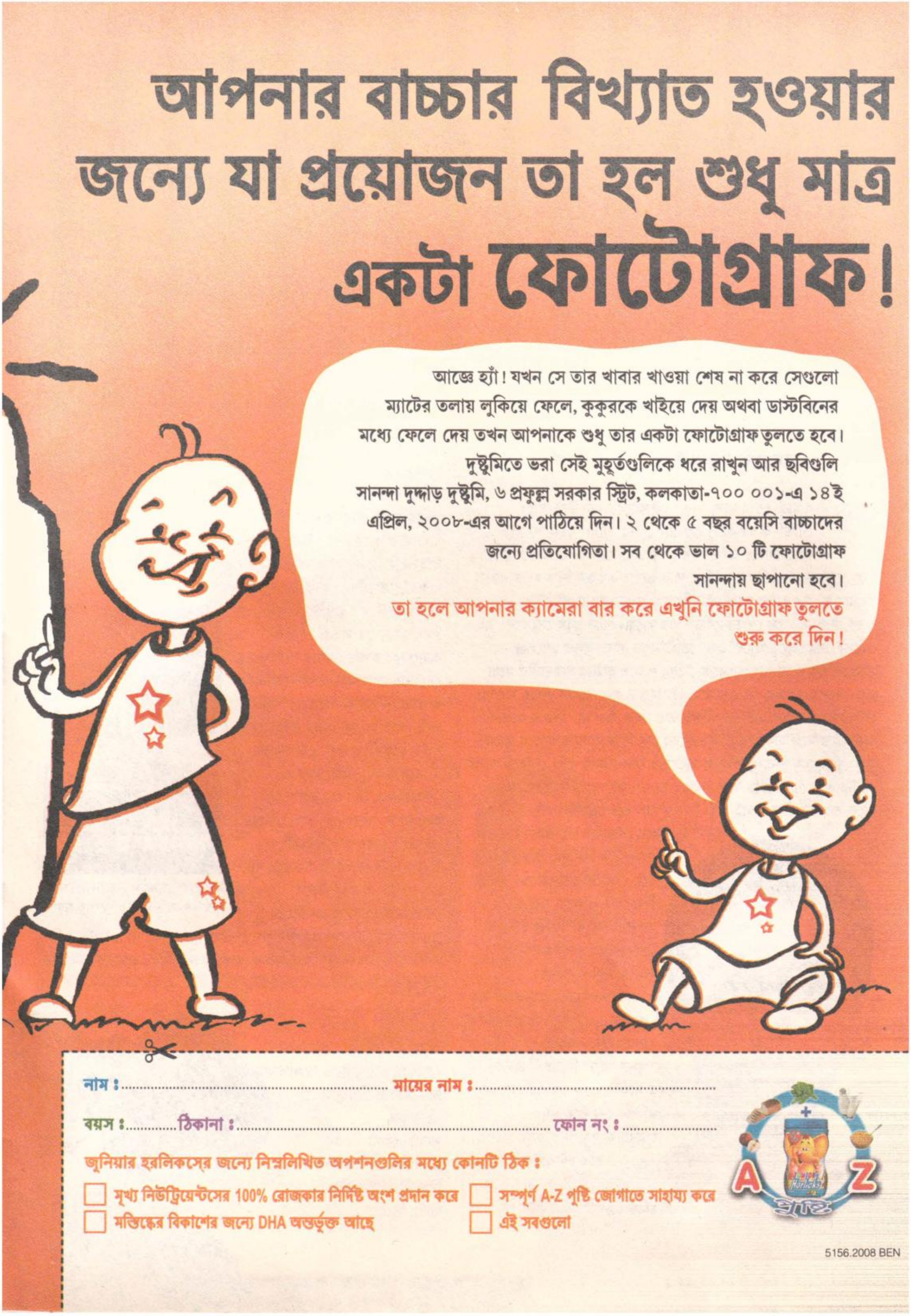
আপনার বাচ্চার বিখ্যাত হওয়ার
জন্যে যা প্রয়োজন তা হল শুধু মাত্র
একটা ফোটোগ্রাফ!
আজ্ঞে হ্যাঁ! যখন সে তার খাবার খাওয়া শেষ না করে সেগুলো ম্যাটের তলায় লুকিয়ে ফেলে, কুকুরকে খাইয়ে দেয় অথবা ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেয় তখন আপনাকে শুধু তার একটা ফোটোগ্রাফ তুলতে হবে। দুষ্টুমিতে ভরা সেই মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখুন আর ছবিগুলি সানন্দা দুদ্দাড় দুষ্টুমি, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১-এ ১৪ই এপ্রিল, ২০০৮-এর আগে পাঠিয়ে দিন। ২ থেকে ৫ বছর বয়েসি বাচ্চাদের জন্যে প্রতিযোগিতা। সব থেকে ভাল ১০ টি ফোটোগ্রাফ সানন্দায় ছাপানো হবে।
তা হলে আপনার ক্যামেরা বার করে এখুনি ফোটোগ্রাফ তুলতে শুরু করে দিন!
নাম : .... মায়ের নাম : ....
বয়স : .... ঠিকানা : .... ফোন নং : ....
জুনিয়ার হরলিকস্‌ের জন্যে নিম্নলিখিত অপশনগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক :
☐ মূখ্য নিউট্রিয়েন্টসের 100% রোজকার নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে
☐ সম্পূর্ণ A-Z পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে
☐ মস্তিষ্কের বিকাশের জন্যে DHA অন্তর্ভুক্ত আছে
☐ এই সবগুলো
A Z পুষ্টি
5156.2008 BEN

বারো বছর বয়সেই নাসা যাচ্ছে শৌভনিক

নাসার জনসন স্পেস সেন্টার

'ডেস্টিনেশন নাসা নলেজ চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতায় প্রথম দশজনের মধ্যে সেরা, ক্লাস সেভেনের ছাত্রটি পাড়ি দিচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সেরা মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্র নাসায়। কী করবে সে সেখানে?

জানাচ্ছেন **বেদদ্যুতি চক্রবর্তী**

আর মাত্র একটা মাস, তার পরই আমেরিকায় উড়ে যাবে শৌভনিক চক্রবর্তী। সেখানে পৌঁছে 'নাসা'-য় (ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) পা রাখবে সে। সঙ্গে থাকবেন বাবা কিংবা মা এবং তার স্কুলের একজন শিক্ষক। ভারতের 'সেরা দশ'-এর দলের সঙ্গে শৌভনিকের দেখা হবে সেখানেই।

কতই বা বয়স এখন শৌভনিকের? মাত্র বারো। পড়ে ক্লাস সেভেনে। এই বয়সেই ভারতজুড়ে আয়োজিত 'ডেস্টিনেশন নাসা নলেজ চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতায় ক্লাস সিক্স থেকে টেনের পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম দশের একজন সে! পুরস্কার, তিনদিনের জন্য নাসায় ঘুরতে যাওয়া। শৌভনিকের স্বপ্নের এই সফর কিন্তু এত সহজ ছিল না। হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। স্কুল, শহর ও ন্যাশনাল ফাইনাল রাউন্ডের তিন-তিনটে গণ্ডি পেরিয়ে তবেই সেরার শিরোপা উঠেছে তার মাথায়। ২০০৭ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল বাছাই পর্ব। টানা দু'মাস ধরে চলেছিল প্রতিযোগিতা।

নাসায় কী করবে শৌভনিক? সেখানে তিনদিন থাকবে সে। এই তিনদিন বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো হবে তাকে। জানবে, কীভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় 'আটলান্টিস' বা 'ডিসকভারি'-র মতো বিভিন্ন স্পেসক্র্যাফ্‌ট। জানবে, নাসার স্পেস অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর সব কাহিনি। একেবারে সামনে থেকে দেখবে নানা ধরনের স্পেসক্র্যাফ্‌ট। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে তার। এ ছাড়া নানা এগ্‌জিবিশন তো রয়েছেই।

শৌভনিক চক্রবর্তী

হায়দরাবাদের 'গীতাঞ্জলি' স্কুলের ছাত্র শৌভনিক ২০০৫ সালেও চলে এসেছিল খবরের শিরোনামে। ক্লাস ফোর-এর ছাত্র তখন। 'ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড'-এ ফার্স্ট হয়ে পেয়েছিল সোনার মেডেল, কম্পিউটার আর সার্টিফিকেট।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলেই বাড়ি ফিরে শৌভনিক ঢুকে পড়তে চায় 'ম্যাজিকের' দুনিয়ায়। হ্যারি পটার পেলে আর কিছু চাই না তার। শৌভনিক আর হ্যারি পটার, দু'জনেরই জন্মদিন জুলাই মাসে। তাই, প্রতিবছর জুলাই মাসে যখনই হ্যারি পটারের নতুন বই বাজারে আসে, জন্মদিনের উপহার হিসেবে বাবা-মা'র কাছে সেই বইটাই চায় শৌভনিক। এনিড ব্লাইটনের 'ফেমাস ফাইভ' সিরিজের বইগুলোও ভীষণ পছন্দ তার।

বাবার সঙ্গে বাড়ির বৈঠকখানায় ছোট্ট কাঠের ব্যাট আর প্লাস্টিকের বল নিয়ে ওয়ান ডে ম্যাচও কি কম আনন্দের! অথবা বোনের সঙ্গে ঘরের মেঝেতে জমজমাট টেবিল টেনিস! এ ছাড়া শৌভনিক অবসর কাটায় বই পড়ে, আর সিন্থেসাইজ়ার বাজিয়ে।

নাসার স্পেসক্র্যাফ্‌ট আটলান্টিস: পৃথিবীর মাটি ছাড়ার আগের মুহূর্তে

"বড় হয়ে কী হবে?" প্রশ্ন করলে নিমেষে উত্তর, "অ্যাস্ট্রোনমার।" শৌভনিকের প্রিয় গ্রহ বৃহস্পতি। বাবা-মাকে ছেড়ে একা-একা সেখানে যেতেও কোনও আপত্তি নেই তার। তা হলে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় এই গ্রহটিই কি হয়ে উঠবে শৌভনিকের কোনও একদিনের গন্তব্য? অনন্ত মহাকাশের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে 'মহাকাশচারী' শৌভনিক কি একদিন পা রাখবে বৃহস্পতির রুক্ষ প্রান্তরে? ভবিষ্যৎই জানাবে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর।

শৌভনিকের প্রিয়

খেলা: ক্রিকেট
রোল মডেল: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়
ছবি আঁকার বিষয়: অরণ্য
রং: সবুজ
খাবার: রোস্ট-চিকেন
ম্যাগাজ়িন: স্পোর্টস কার
বিজ্ঞানী: আইনস্টাইন
প্রাণী: সিংহ

শুরু হল দমফাটা হাসির কমিক্‌স

কলকাতার হালচাল

কাহিনি: শিবরাম চক্রবর্তী

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

মানে?
মানে, কেউ কারও খবর রাখে না। এমনকী পাশের বাড়ির লোকও নয়। অথচ আশ্চর্য, রাস্তায় বেরোলে শুধু মানুষ আর মানুষ!
একটু পরে
তবে তো ভারী ভাবনার ব্যাপার দাদা। আমাদের ব্যাপার তো জানোই। অনর্গল কথা না বললে ভাত হজম হয় না।
শুধু কি তাই? কথা বলার জন্য আমরা কাজ পণ্ড করতে রাজি। লোককে নেমন্তন্ন করতে, এমনকী ঝগড়া করতেও রাজি।
তবে কি আমরা কলকাতা যাব না?
আলবাত যাব। যা থাকে কপালে!
হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবই যাব।
অনেক শুনেছি কলকাতা সম্বন্ধে। এবার সব দেখব।
টাকা তো অনেক কামানো হল। এবার কিছু কমানো দরকার।
তা ছাড়া আমরা তো আর ফেরারি আসামি নই!
যে সাতজন্ম আমাদের অসমেই কাটাতে হবে?

সাত দিন পরে শিয়ালদহ স্টেশনে।
কিন্তু পানুর দেখা নেই!
4
ঘণ্টাখানেক পরে...
আশ্চর্য, পানু ব্যাটা গেল কোথায়?
ভারী অদ্ভুত!
আচ্ছা দাদা, এমনও তো হতে পারে, সারারাত হিসেব মিলিয়ে পানুবাবু ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে!
উঁহু।
বা এমনও তো হতে পারে যে, কিছুতেই হিসেব মেলাতে না পেরে বাকি যা ছিল তা নিয়ে ব্যাটা সরে পড়েছে?
উঁহু।
তবে কী?
আরে বুঝলি না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা মিথ্যে বলেনি।
তা বলে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না?
তাই তো দেখছি! চল, বাইরে বেরোই।
চলো, ঠিকানাটা তো চিঠিতেই আছে।
চিঠিটা আছে তো?
ওঃ! চিঠিটা তো সঙ্গে নেই! তবে ঠিকানাটা মনে হয়, হ্যাঁ, ১৩/১২ রসা রোড, ভবানীপুর।
চল।

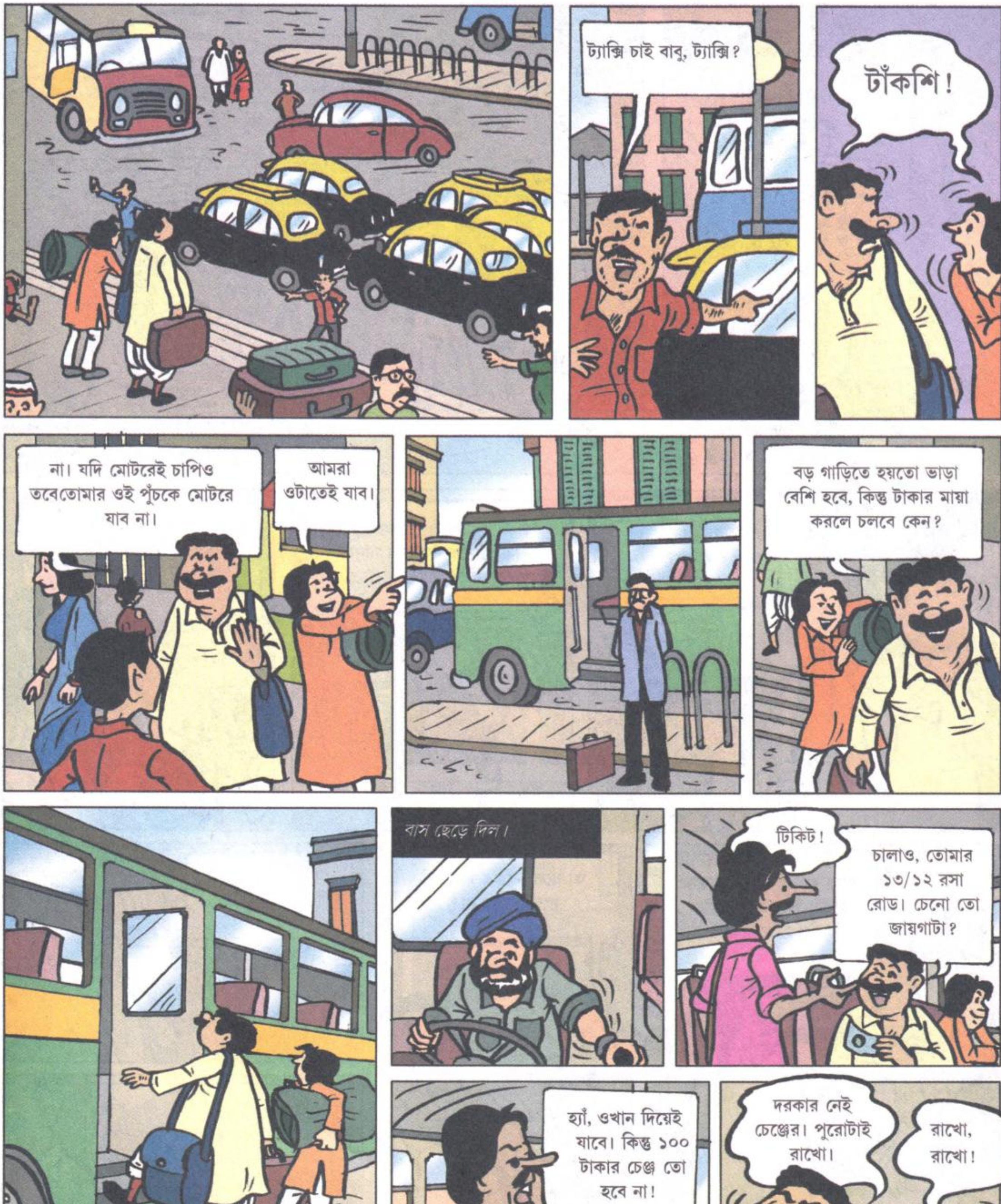
ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি?
টাঁকশি!
না। যদি মোটরেই চাপিও তবেতোমার ওই পুঁচকে মোটরে যাব না।
আমরা ওটাতেই যাব।
বড় গাড়িতে হয়তো ভাড়া বেশি হবে, কিন্তু টাকার মায়া করলে চলবে কেন?
বাস ছেড়ে দিল।
টিকিট!
চালাও, তোমার ১৩/১২ রসা রোড। চেনো তো জায়গাটা?
হ্যাঁ, ওখান দিয়েই যাবে। কিন্তু ১০০ টাকার চেঞ্জ তো হবে না!
দরকার নেই চেঞ্জের। পুরোটাই রাখো।
রাখো, রাখো!

অ্যাঁ!
চিরকাল মোটরের গল্প শুনেছি। আজ চাপার সুযোগ হয়েছে। যত টাকা লাগুক, কেয়ার করি না।
দিব্যি গাড়ি দাদা, দেখেছ? গদিমোড়া সিট, আবার একটা আয়নাও আছে।
একটা মোটর কিনে নিয়ে যেতে হবে বলো, যাওয়ার সময়?
আলবাত।
কিনতেই হবে। এরকম বড় একটা। নইলে অসমের সম্মান থাকবে কেন?
থাক, কিছু বলিস না।
দাদা! দেখেছ?
দাদা, একটা খিদিরপুর।
না না, অসম্ভব। টিকিট নয়।
আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য। পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।
যতক্ষণ ইচ্ছে মনের আনন্দে বাসে চড়ুন।
!?!?

বাস পরের স্টপে দাঁড়াল।
দাঁড়াও বাবা, দাঁড়াও।
মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না! আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, হাওয়া খান, অসুবিধে নেই!
মনে করুন নিজের গাড়ি।
!?
দু'-চার মিনিটের মধ্যে...
আরে এদিকে আয়,
একদম খালি গো!
দাঁড়া, আসছি!
কে বলেছিল রে, কলকাতার লোক মিশুকে নয়?
এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই...
না। এভাবে হবে না। দাঁড়া!
সামনে গিয়ে...
আপনারা আমাদের গাড়িতে চড়েছেন, পরম সৌভাগ্য! আরামে বসুন, হাওয়া খান! কিন্তু পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।

কী ব্যাপার গো?
তাজ্জব!
সরকারের অসীম দয়া!
ভাড়া বেঁচে গেল!
যা বলেছিস!
যাত্রীরা সকলে হতবাক!
হঠাৎ...
দাদা দাদা, দ্যাখো দ্যাখো!
দাদা, ওদের দাড়ি হয় না?
না, ওরাই এ জগতে সুখী। কামাবার হাঙ্গামা নেই।
দাদা, পরের স্টপ রসা রোড। আপনাদের নামতে হবে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো উঠছি!
বন্ধুগণ, আপনারা যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের গাড়িতে চাপুন। যেখানে যেতে হয় যান। ভাড়া কম পড়লে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যাবেন।
১৩/১২ রসা রোড, কেমন!

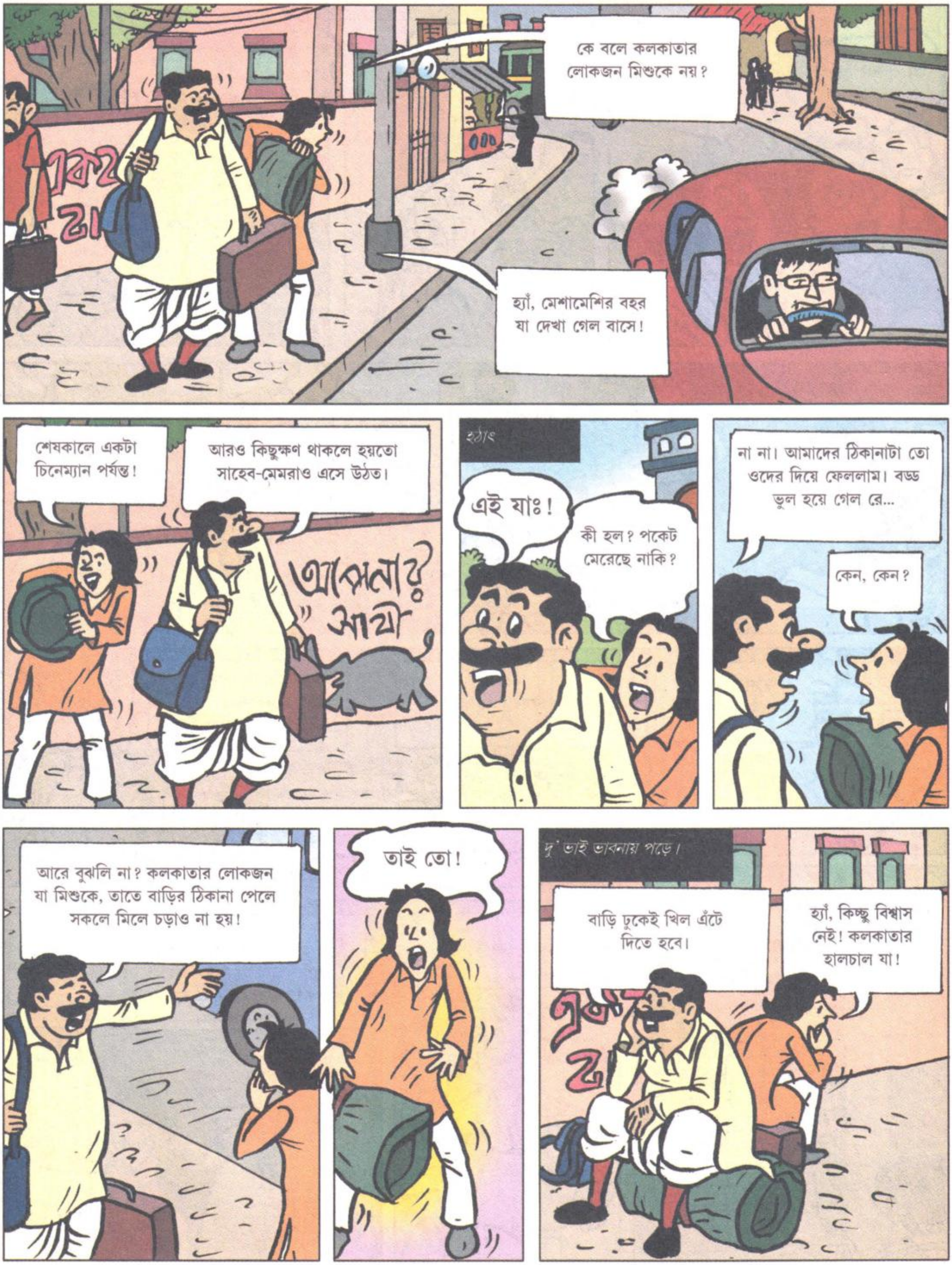
কে বলে কলকাতার
লোকজন মিশুকে নয়?
হ্যাঁ, মেশামেশির বহর
যা দেখা গেল বাসে!
শেষকালে একটা
চিনেম্যান পর্যন্ত!
আরও কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো
সাহেব-মেমরাও এসে উঠত।
হঠাৎ
এই যাঃ!
কী হল? পকেট
মেরেছে নাকি?
না না। আমাদের ঠিকানাটা তো
ওদের দিয়ে ফেললাম। বড্ড
ভুল হয়ে গেল রে...
কেন, কেন?
আরে বুঝলি না? কলকাতার লোকজন
যা মিশুকে, তাতে বাড়ির ঠিকানা পেলে
সকলে মিলে চড়াও না হয়!
তাই তো!
দু' ভাই ভাবনায় পড়ে।
বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে
দিতে হবে।
হ্যাঁ, কিচ্ছু বিশ্বাস
নেই! কলকাতার
হালচাল যা!

এটাই রসা রোড। বাড়ির ঠিকানাটা কাকে জিজ্ঞেস করা যায়?
৮/২ রসা রোড
বাড়ির ঠিকানাটা তো পাওয়াই গিয়েছে। এখন ঠিকানার বাড়ি বলো!
আরে, ওই একই হল! কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করা যায় বল তো?
যাকেতাকে জিজ্ঞেস করাও তো আবার নিরাপদ নয়!
হ্যাঁ, যা মিশুকে লোকজন সব!
একটু পরে...
দাদা, ওই যে, ওকে জিজ্ঞেস করব?
নিরাপদ তো?
মনে তো হয়! ওহে খোকা, শোনো!

'খোকা' বললে আমি সাড়া দিই না!
তবে কী বললে সাড়া দাও শুনি?
আমি কি খোকা নাকি, অ্যাঁ? খোকা তো যারা দুধ খায়।
আচ্ছা, আচ্ছা! আমাদের ভীষণ অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এখন বলো তো হে, ১৩/১২ বাড়িটা কোথায়?
১৩/১২?
হ্যাঁ, হ্যাঁ।
১৩/১২ বা ত্রয়োদশের দ্বাদশ।
আরে! আমিই তো ১৩/১২। আমার বয়স তেরো। স্কুলে বারো লিখিয়েছি।
এমন সময় হঠাৎ...
মাঠে যাচ্ছি, চল চল!
আমি ১৩/১২! হে হে হে!

কিছু বুঝলে দাদা?
বুঝব না কেন? কলকাতার সাইকেলের ক্যারিয়ারগুলো ছেলেদের জন্য রিজার্ভ করা।
ও যে ১৩/১২ বলে গেল নিজেকে?
আরে বোকা, এখানে যেমন ঘরবাড়ির নম্বর আছে, তেমন প্রত্যেক ছেলেরই একটা করে নম্বর আছে। মার্কামারা সব!
তাই তো! নম্বর না থাকলে এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে খুঁজে পাবে কে?
এই তো বুঝেছিস, কলকাতা বড় শক্ত জায়গা রে। বুদ্ধি না থাকলে...
দাদা, দাদা!
ওই তো ১৩/১২!

ও বাবা! এ তো পেল্লায় বাড়ি রে!
নিশ্চয়ই অনেক ঘর আছে? দু'জনে এত ঘরে শোব কী করে?
তুমি একটায় শোও, আমি একটায়। রোজ পালটে-পালটে।
না, না। আমার একা শুলে ভূতের ভয় করবে। তুই আমার সঙ্গেই শুবি।
ঠিক আছে, ঠিক আছে! এবার চলো!
এ কী!
তালা ভেঙে ঢুকব দাদা?
কিন্তু চৌকিদার?
দুর! কলকাতায় আবার চৌকিদার আছে নাকি?
নেই? তবে ভেঙেই ফ্যাল।

দুর দুর, এভাবে হবে না!
উফ। যেমন তালা, তেমনই দরজা! বাপ রে!
না, না। এ হল ভাল কাজের ফল!
মানে?
মানে, কলকাতায় ভাল কাঠ রপ্তানি করার ফল।
দাদা, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।
কী?

এই লোহার পাইপটা সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে, দেখেছ?
তাতে কী?
আমি পাইপ বেয়ে ছাদে উঠি। তারপর ভিতর থেকে একটা জানলা খুলে দেব। তখন তুমি ঢুকো।
পারবি?
ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে। সড়সড়িয়ে নেমে পড়ো।
কিন্তু না উঠলে নামবি কী করে?
তা হলে বারকয়েক ওঠানামা করে ফেলি, কী বলো দাদা?
হুঁ, খুব ভাল এক্সারসাইজ। এর ফলে তোর সাইজও বাড়বে। কিন্তু আজ আর নয়! কাল থেকে করিস!
দরজা ছেড়ে পাইপ বেয়ে বাড়িতে ঢুকতে হচ্ছে। ধন্য কলকাতার হালচাল!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। আমাদের উচিত সেনাবাহিনী সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা। তাই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়েই এবারের কুইজ়।

কু ই জ়

১ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার পদে কে থাকেন?

২ 'ভারতীয় মিলিটারি আকাদেমি' কোন শহরে অবস্থিত?

৩ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ সাম্মানিক পদ 'ফিল্ডমার্শাল'-এর পদে এ পর্যন্ত দু' জন অধিষ্ঠিত হয়েছেন। একজন জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা। অন্যজন কে?

৪ ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যবহৃত ইনসাস (INSAS) রাইফেলের 'ইনসাস' শব্দটির পুরো অর্থ কী?

৫ সেনাবাহিনীর 'জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুল' কোথায় অবস্থিত?

৬ অর্জুন, অজেয়, ভীষ্ম — ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এগুলো কিসের নাম?

৭ কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারতের সেনাপ্রধান কে ছিলেন?

৮ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতর কলকাতার কোথায় অবস্থিত?

অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

গত সংখ্যার উত্তর

১. টুর দ্য ফ্রান্স।

২. দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।

৩. মহম্মদ আলি জিন্না।

৪. জাপান।

৫. দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

৬. রুডিয়ার্ড কিপলিং।

৭. ভুটান।

৮. নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড।

জবাব চাই

১. এখনও পর্যন্ত দু' জন বাঙালি ভারতের সেনাপ্রধানের পদ অলংকৃত করেছেন? এঁদের একজন জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী। অপরজন কে?

২. ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান কোনটি? বীরচক্র, পরমবীরচক্র না অশোকচক্র?

৩. 'তারে জ়মিন পর' ছবিটির পরিচালক কোন বিখ্যাত অভিনেতা?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. দ্য ডেলি প্ল্যানেট। ২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. মহারাষ্ট্র।

সঠিক উত্তরদাতা

রিয়া, ঈশিতা, অনিন্দিতা এবং সুস্মিতা, দশম শ্রেণি, দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যামন্দির; **দেবোপম রায়, আনন্দরূপ চক্রবর্তী, মহেন্দ্র পোদ্দার, সুমন**

চট্টোপাধ্যায়, হর্ষ সাহা, প্রীতম দে এবং প্রীতম কর্মকার, সপ্তম শ্রেণি, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির; **সুমন মিত্র**, দশম শ্রেণি, যোধপুর পার্ক বয়েজ় স্কুল; **রাজর্ষিরঞ্জন ভট্টাচার্য**, অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, বিবেকনগর, আগরতলা; **সায়ক চট্টোপাধ্যায়**, অষ্টম শ্রেণি, **তিতাস চট্টোপাধ্যায়**, তৃতীয় শ্রেণি, পাঠভবন,

শান্তিনিকেতন; **সায়রী গুপ্ত**, ষষ্ঠ শ্রেণি, হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা; **তূর্য বসু**, নবম শ্রেণি, হেয়ার স্কুল, কলকাতা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

Dabur
এখন মা বলে
চকলেট বাচ্চাদের
জন্যে প্রয়োজনীয়
চকলেট টেস্ট আর ভিতরকার শক্তিতে ভরপুর নতুন ডাবর চ্যবন জুনিয়ার।
যখন চকলেটে টেস্ট মোড়া জড়িবুটি দিনটিকে শুরু করে তখন টেস্ট আর স্বাস্থতে কেনই বা মেলবন্ধন না হবে। নতুন ডাবর চ্যবন জুনিয়ার আপনার বাচ্চাকে রাখে স্ফুর্তিতে ভরা আর সর্বদা আগে।
পিপ্পলী
আমলা
যষ্টিমধু
দ্রাক্ষা
Dabur
Chyawan Junior
With Tasty Chocolate Granules
FREE
Apun ka Style
এখন মায়ের স্টাইলটাই, এটা আমারও স্টাইল!
বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্বাস্থ বিশেষজ্ঞ কে apunkastyle@dabur.com তে ই মেইল করুন, www.dabur.com/chyawanjun
তে লগ অন করুন অথবা ডাবর চ্যবন জুনিয়ার ডাবর ইন্ডিয়া লি., পি.ও. বক্স-3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ-201010 (U.P.) কে লিখুন।

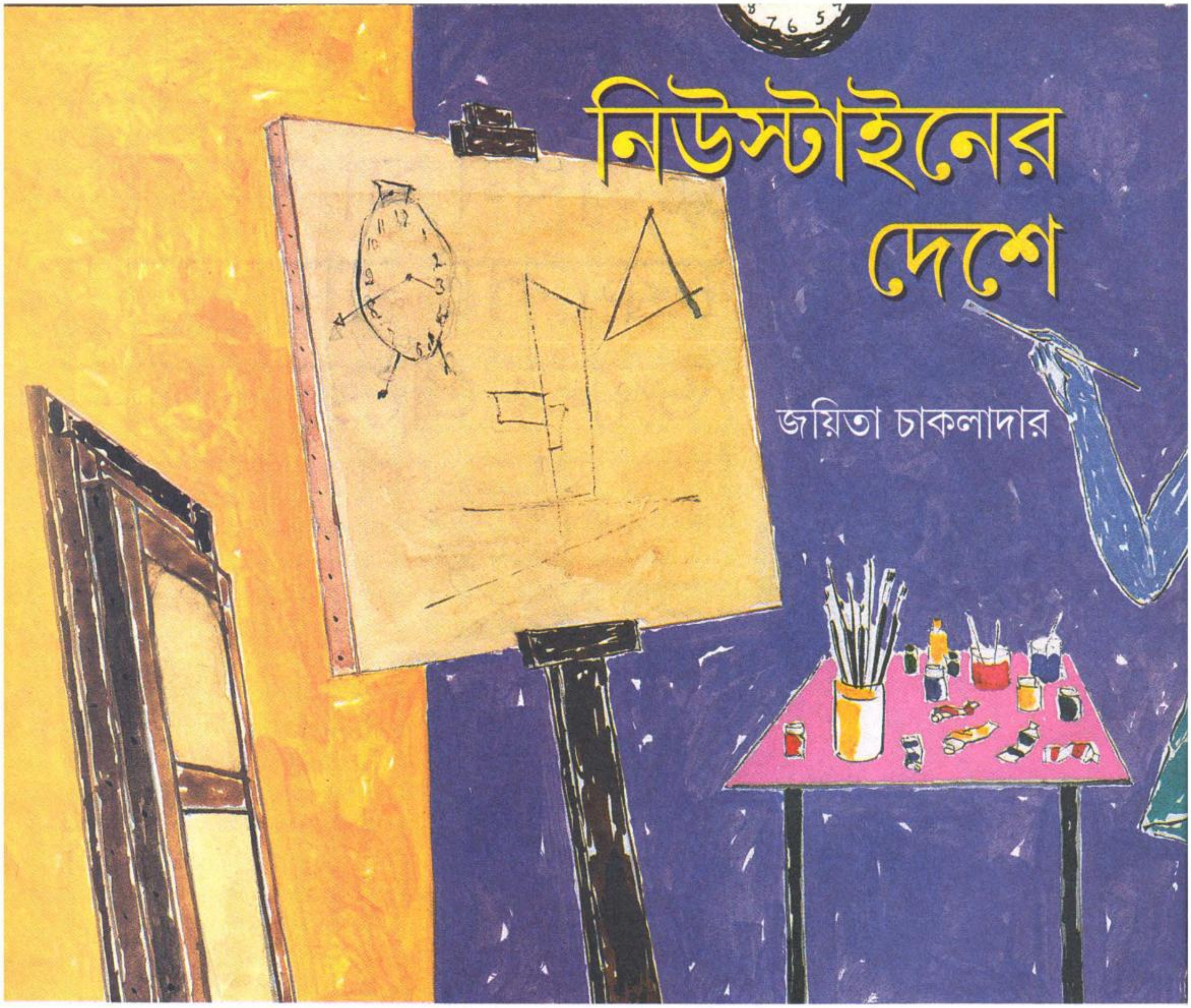

নিউস্টাইনের দেশে

জয়িতা চাকলাদার

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে সুমনের খুব অস্বস্তি হতে লাগল। খানিকক্ষণ এপাশওপাশ করে বিছানার উপর উঠে বসল সে। দেখল, সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। অথচ মাথার উপর জোরে পাখা ঘুরছে, জানলা দিয়েও তিরতির করে হাওয়া আসছে। অক্টোবর মাসের শেষ দিক, ফলে গরমও তীব্র নয়। তা হলে এত ঘেমে যাওয়ার কারণ কী?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সুমন বিছানা থেকে নামল। বাথরুম ঘুরে এসে ফ্রিজ খুলে একটা ঠান্ডা জলের বোতল বের করে ঢকঢক করে প্রায় আধ বোতল জল খেয়ে নিল। তারপর নিজের ঘরে এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। ভাবতে লাগল, শরীরের মধ্যে হঠাৎ এরকম অস্বস্তি হচ্ছে কেন? মনটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য ঘরের কোনায় রাখা অসমাপ্ত ক্যানভাসটার দিকে সে তাকাল। ছবিটা এখনও শেষ হয়নি। আজই হয়তো শেষ হয়ে যেত, যদি না দু'টো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রং শেষ মুহূর্তে ফুরিয়ে যেত। কালই ধর্মতলায় গিয়ে দু'টো রঙের টিউব কিনতে হবে। যতক্ষণ না ছবিটা পুরোপুরি শেষ হচ্ছে ততক্ষণ মনের মধ্যে থেকে এই অতৃপ্তিটা কিছুতেই যাওয়ার নয়। ছবির ক্যাপশন নিয়েও খানিকক্ষণ ভাবল, ছবিটার নাম সে দিয়েছে 'মডার্ন টাইমস'।

ক্যানভাসটার এক কোনায় একটা বড় ঘড়ি আঁকা হয়েছে। তাতে তিনটে চল্লিশ বাজে। সিগারেটটা শেষ করে শুতে যাওয়ার আগে সুমন দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এই ঘড়িতেও তিনটে চল্লিশ বাজে। ভাবল, এ তো কাকতালীয় ব্যাপার! বিছানায় শুতে গিয়ে দেখল, বিছানাটা একদম তেতে আছে। যেরকম জ্যৈষ্ঠমাসের তীব্র গরমের রাতে থাকে, ঠিক সেরকম। কিছু না ভেবে ঠান্ডা মেঝেতেই সে শুয়ে পড়ল।

শোয়ার খানিকক্ষণ পর যখন চোখটা প্রায় লেগে এসেছে, হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন কীরকম একটা চিনচিনে কম্পন হতে শুরু করল। দূর থেকে একটা ধাতব কিন্তু সুরেলা মেয়েলি কণ্ঠস্বর তার মাথার মধ্যে যেন অনুরণিত হতে লাগল। সে দু' হাত দিয়ে কান চেপে ধরল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারল যে, শব্দটা তার কান দিয়ে ঢুকছে না। কারণ, কান চেপে ধরার পরেও শব্দের তীব্রতার কোনও পার্থক্য হল না। শব্দটা কোনওভাবে সরাসরি তার মাথায় ঢুকেছে।

সে মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ওই

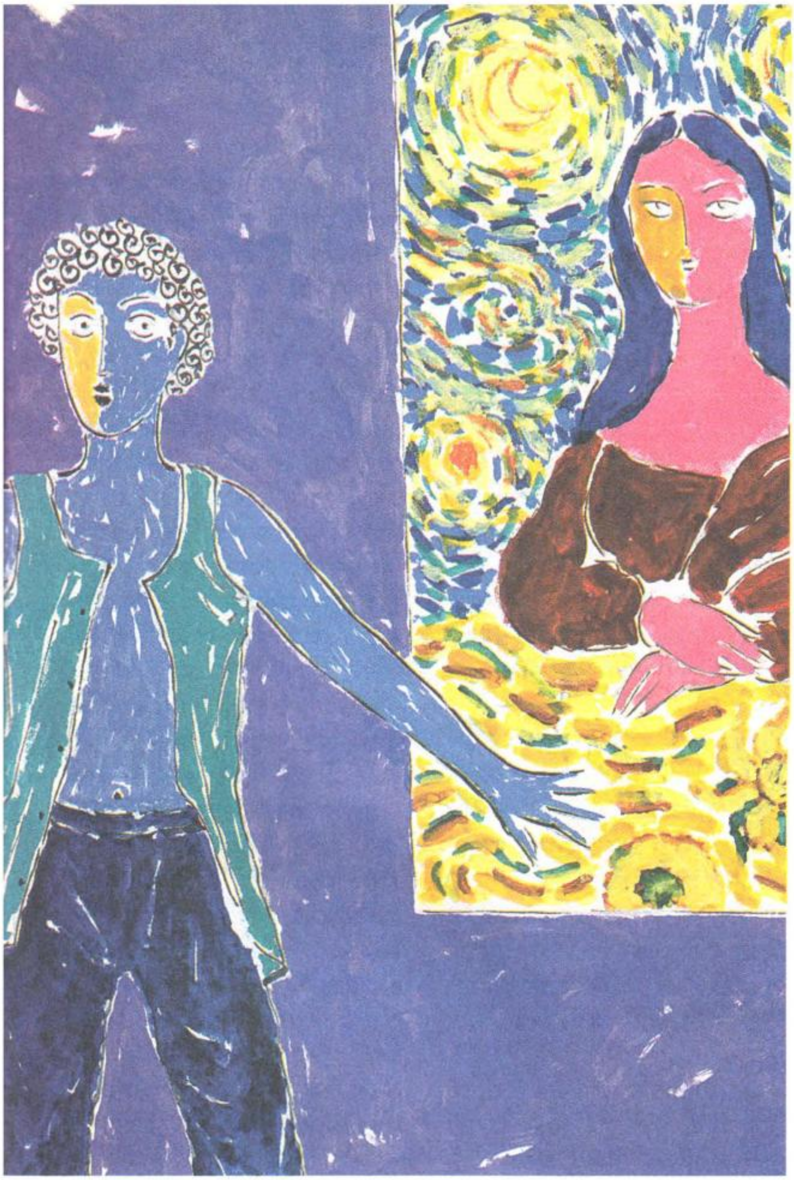

কণ্ঠস্বরের বক্তব্যটা কী। আমাদের মা-ঠাকুরমারা যেরকম সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন, ঠিক সেইরকম সুর করে ওই কণ্ঠস্বরটা কী যেন বলছে। সুমন প্রথমে ভাবল, সে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে। যদিও পরক্ষণেই বুঝল, সে জেগে আছে। মাথার মধ্যে কীরকম ঝিমঝিমে একটা আমেজের ফলে চোখের পাতা দু'টো এত ভারী হয়ে গিয়েছে। তাই সে চোখ খুলতে পারছে না। এবার সুমন শুনতে পেল, মাথার মধ্যে ওই মেয়েলি কণ্ঠস্বরটা সুর করে তার নাম ধরে ডাকছে, "সুমন, সুমন, সু-উ-উ-উ-মন।"

তার হঠাৎ কীরকম গা ছমছম করে উঠল। ভাবল, এ কী করে সম্ভব? এই অচেনা, অজানা কণ্ঠস্বরের অধিকারী তার নাম জানল কী করে? সে চুপ করে রইল। কিন্তু দেখল, সে চুপ করে থাকলেও ওই কণ্ঠস্বর চুপ করে নেই। অনবরত তার নাম ধরে ডেকেই চলেছে, আর তার মাথার মধ্যে সেই নামের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তখন সে ভাবল, একবার ওই ডাকে সাড়া দিয়ে দেখা যাক কী হয়? কিন্তু সে মুখে কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না। মনে-মনে বলল, 'আমাকে ডাকছ কেন?'

সাড়া দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সুমন একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করল। সেই সঙ্গে এটাও বুঝল, চোখের পাতা দু'টো এখন আর অত ভারী নেই। চোখ খুলে সে চমকে গেল। দেখল, খুব হাল্‌কা একটা নীলচে সবুজ আলোয় তার ঘর ভরে গিয়েছে। খুব দ্রুতগতিতে তার ঘরের দেওয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র, তার তুলি, প্যালেট, ক্যানভাস সব কিছুর আকার বেড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে তার ঘরের আকার আগের দু'গুণ, তিনগুণ, চারগুণ, তারপর আরও-আরও বড় হতে লাগল। তার সঙ্গে সমান তালে অন্য সব জিনিসও একই হারে বাড়তে লাগল।

এবার সুমন খুব ভয় পেয়ে গেল। যদিও একটু পরেই সে বুঝতে পারল, আসলে কিন্তু তার ঘর বা ঘরের আসবাব কিছুরই আকার বাড়ছে না। তার নিজের আকার ছোট হচ্ছে এবং সেটাও বেশ দ্রুতগতিতে। ছোট হতে-হতে তার আকার প্রায় একটা বিন্দুর মতো হয়ে গেল। সুমন মনে-মনে বলল, 'কে তুমি? আমার এ অবস্থা করলে কেন?'

ওই কণ্ঠস্বর তাকে বলল, "ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তোমার আকার এরকম না হলে তুমি মাটির মধ্যে ঢুকতে পারতে না। এখন আমাদের পৃথিবীতে এসো।"

একথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সুমন দেখল, ওই সবুজ আলোর আভা তাকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করেছে। ক্রমশ সেই আলোর পাক খাওয়ার গতি এত বেড়ে গেল যে, আলোর কেন্দ্রে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হল। সুমন অনুভব করল, সে ধীরে-ধীরে কোনও অদৃশ্য কিছুর টানে ওই ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল, সে মাটির মধ্যে ঢুকেছে। কোনও বহুতল বাড়ির লিফ্‌টের তার ছিঁড়ে গেলে লিফ্‌ট যেমন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাটির দিকে নামতে থাকে, ঠিক সেইরকমভাবে সুমন মাটির গভীরে দ্রুতগতিতে ঢুকতে থাকল। সে তার দু' হাত দিয়ে আশপাশের মাটির কণা, গাছের শিকড় ধরার চেষ্টা করলেও কিছুই ধরতে পারল না। কারণ, তার গতি এত বেশি ছিল যে, কোনও কিছু তার হাতের নাগালে এসেই চলে যাচ্ছিল।

সুমনের মনে হল যেন দিন, মাস, বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু থামতে পারছে না। সে বুঝতে পারল, কিছুই আর তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল যদি কখনও থামে। আর-একটা বিষয় অনুভব করতে পারছিল, সে যত মাটির গভীরে ঢুকছে, তত নিজেকে হাল্‌কা মনে হচ্ছে। তার আশপাশের তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এক সময় তার মনে হল, সে বোধ হয় পাখির পালকের চেয়েও হাল্‌কা। আবার তার চোখের পাতা দু'টো ভারী

হয়ে এল। তা ছাড়া একইভাবে অনেকক্ষণ নীচের দিকে নামতে-নামতে সারা শরীরে কীরকম একটা ঝিমঝিমে ভাব। ফলে, সে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে মনে নেই, হঠাৎ তার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। চোখ খুলে প্রথমে খানিকক্ষণ কিছু দেখতে পেল না। আস্তে-আস্তে চোখ সয়ে যাওয়ার পর দেখল, চারদিক হাল্কা নীলচে সবুজ আলোয় ভরা, ঠিক যেরকম আলো সে তার নিজের ঘরে দেখেছিল। সুমন উঠে দাঁড়াল, চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, উঁচু পাঁচিলে চারদিক ঘেরা। হঠাৎ সে আবার সেই সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কণ্ঠটি তাকে বলছে, "ডান দিকের পাঁচিলটার কাছে চলে এসো! দ্যাখো, ওখানে এক জায়গায় চৌকো দাগ কাটা আছে। সেই দাগের উপর পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।"

সুমন সম্মোহিতের মতো পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। দাগটা খুঁজে বের করে সেখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। দেখল, তাকে নিয়ে দেওয়ালের ওই অংশটা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। পাঁচিলটা হঠাৎ ঘুরে যাওয়ার ফলে গতিজাড্যের কারণে ভারসাম্য না রাখতে পেরে সুমন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার শুনতে পেল সেই কণ্ঠস্বর, "আমাদের পৃথিবীতে স্বাগত জানাচ্ছি!"

সে মনে-মনে বলল, 'তুমি কে? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

কণ্ঠস্বরটি বলল, "ধৈর্য ধরো। আমাদের মধ্যে অনেককেই তুমি দেখতে পাবে। তবে যতক্ষণ না দেখতে পাও ততক্ষণই তোমার পক্ষে মঙ্গল। যাকগে, ও কথা বাদ দাও। তুমি আমাকে এটা বলো, তুমি কি বুঝতে পেরেছ, কোথায় এসে পড়েছ?"

সুমন বলল, "না, আমি বুঝতে পারছি না আমি কোথায়? এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। তোমরা কারা? তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কীভাবে? আর কেনই বা নিয়ে এলে? আমার শরীরকে এত ছোট বানিয়ে ফেললে কীভাবে?"

এবার ওই কণ্ঠস্বর খুব জোরে হেসে বলল, "বাব্বা, একবারে এত প্রশ্ন! দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক-এক করে সব জানতে পারবে। চিন্তা কোরো না।"

সুমন বলল, "আর-একটা কথা। তুমি আমার নাম জানো অথচ আমি তোমার নাম জানি না, এটা ঠিক নয়। তোমার নাম কী?" ওই কণ্ঠস্বরটি বলল, "আমার নাম মাদাম দুভলভে। তুমি আমাকে ওই নামেই ডেকো। এখন শোনো, তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে। কীভাবে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, কেন আনা হয়েছে, সব বলব। তবে এক্ষুনি তোমাকে যেটা বলব, সেটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। সেটা হল, তুমি এখন পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রে আছ।"

এটা শুনে সুমন খুব জোরে হেসে বলল, "এই কথাটা ঠিক বিশ্বাস হল না।"

মাদাম দুভলভে বলল, "কেন? বিশ্বাস হল না কেন?"

সুমন বলল, "যদিও আমি শিল্পী, ছবি আঁকাই আমার নেশা ও পেশা, তবুও এটুকু জ্ঞান আমার আছে যে, পৃথিবীর কেন্দ্রের উষ্ণতা এমনই, সেখানে কোনও প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। তা ছাড়া পৃথিবীর কেন্দ্রে সবকিছুর ওজন শূন্য হয়ে যায়। আমার ওজন শূন্য হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কারণ, ওজন শূন্য হয়ে গেলে আমি হাঁটতে পারতাম না, ভেসে বেড়াতাম।"

মাদাম দুভলভে হেসে বলল, "ও, এই কথা! হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিকই বলেছ। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনও প্রাণীর বেঁচে থাকারও কথা নয়। হেঁটে বেড়ানোরও কথা নয়। আমরা যেখানে আছি সেখানে কৃত্রিমভাবে প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা আর কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে কারও ওজন শূন্য না হয়ে যায়। এবার বুঝতে পারলে তো? এখন আর সময় নষ্ট না করে সামনের দিকে এগোও।"

সুমন বলল, "আমার খুব খিদে পেয়েছে মাদাম।"

মাদাম বলল, "বেশ, তা হলে তুমি বাঁ দিকে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে দ্যাখো, একটা গোল বেদিমতো আছে। ওটার উপর উঠে দাঁড়াও।"

সুমন তাই করল। বেদিতে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই সুমনের উপর ঠিক যেন ফুলঝুরির মতো আগুনের ফুলকি ঝরে পড়তে শুরু করল। ভয় পেয়ে সুমন লাফ দিয়ে বেদি থেকে নেমে পড়ল। মাদাম দুভলভে হাল্কা ধমক দিয়ে তাকে বলল, "কী হল? নেমে পড়লে কেন? তুমি যা ভাবছ তা নয়! ওগুলো আগুনের ফুলকি নয়।"

সুমন বলল, "তা হলে ওগুলো কী?"

মাদাম বলল, "ওগুলো শক্তিকণা। তোমরা খাবার খাও কেন? তা থেকে শক্তি পাওয়ার জন্যই তো? আমরা এখানে সরাসরি শক্তি গ্রহণ করি। খাবার থেকে শক্তি পেতে অনেক সময় লাগে। প্রথমে খাবার খেতে হয়, তারপর নিশ্বাসের সাহায্যে গ্রহণ করা অক্সিজেন সেই খাবারের শক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। তবে সেই শক্তি ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। এখানে মুক্ত অক্সিজেনের খুব অভাব। ফলে খাবার থেকে ওইভাবে শক্তি উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই আমরা এখানে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শক্তি উৎপাদন করি। সেই শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের আউটলেটগুলো ওইরকম বিভিন্ন বেদির উপর ফোকাস করা। যার যখন শক্তির দরকার হয়, সে তখন ওইরকম একটা বেদির উপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে ওই যন্ত্রের আউটলেট দিয়ে প্রবলবেগে শক্তিকণা বের হতে থাকে। আর তার শরীরে সরাসরি ওই শক্তির আত্তীকরণ ঘটতে থাকে। আবার বেদি থেকে নেমে পড়লেই ওই শক্তিকণা নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক যেমন তুমি বেদি থেকে নেমে পড়ার পর হল।"

একথা শুনে সুমন আবার ওই বেদির উপর উঠে পড়ল। ওইরকম আলোর ঝরনা শুরু হল। কিছুক্ষণ পর সে অনুভব করল, তার খিদে একেবারে চলে গিয়েছে। বরং সারা শরীরে বেশ একটা চনমনে ভাব এসেছে। তখন বেদি থেকে সে নেমে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে আলোর ঝরনাও বন্ধ হয়ে গেল। মাদাম দুভলভে বলল, "কী, খিদে মিটেছে তো? এবার সামনের দিকে এগোও।"

সুমন বলল, "মাদাম, আর-একটা প্রশ্ন আছে।"

মাদাম বলল, "আবার কী হল?"

সুমন বলল, "এত ভাল বাংলা বলো কী করে? তুমি কি বাঙালি? তোমার নাম শুনে মনে হয় না তুমি বাঙালি।"

মাদাম বলল, "এই প্রশ্নটা কি তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলের করা উচিত হল?

বাঙালি কাকে বলা হয়, যে বঙ্গে বাস করে, তাকে। এখানে তো বঙ্গদেশের কোনও অস্তিত্বই নেই। আর বাংলা ভাষার কথা বলছ? আমাদের এখানে সকলেই পৃথিবীর সমস্ত ভাষা বলতে পারে, বুঝতে পারে। সেভাবেই সকলকে তৈরি করা হয়েছে।"

সুমন জিজ্ঞেস করল, 'তৈরি করা হয়েছে মানে?"

মাদাম বলল, "ধীরে, বৎস, ধীরে। সব জানতে পারবে। জানানোর জন্যই তো তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। একটু ধৈর্য ধরো। আপাতত তোমার সব প্রশ্ন শেষ হয়েছে কি?"

সুমন বলল, "না, শেষ হয়নি। আগে বলো, আমাকে এত ছোট বানিয়ে ফেললে কীভাবে?"

মাদাম দুভলভে বলল, "আলট্রাগ্রিন রশ্মির সাহায্যে। মনে পড়ছে, তোমার ঘর থেকে আমাদের জগতে ঢোকার ঠিক আগে তোমার ঘরটা নীলচে-সবুজ আলোয় ভরে গিয়েছিল? সেটা হয়েছিল ওই আলট্রাগ্রিন রশ্মির প্রভাবে। তুমি হয়তো একটা জিনিস বুঝতে পারোনি, তোমাকে শুধু ছোটই করে ফেলা হয়নি, তার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পার্টিকল্স ঢোকানো হয়েছে। তুমি তো জানোই, পৃথিবীর কেন্দ্রে অত্যন্ত শক্তিশালী ম্যাগনেট অবস্থান করে। আমরা কৃত্রিমভাবে তার ম্যাগনেটিক পাওয়ার কিছুক্ষণের জন্য একশো গুণ করে দিতে পারি। এবং তার লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারি, সেটা কাকে আকর্ষণ করবে। এইভাবে ওই চুম্বক দিয়ে আকৃষ্ট করে তোমাকে পৃথিবীর কেন্দ্রে আনা হয়েছে। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমার কাজ হয়ে গেলে তুমি আবার আগের আকার ফিরে পাবে, আর নিজের জগতেও ফিরে যেতে পারবে। কী, এবার তোমার মনের সব অন্ধকার দূর হয়েছে তো? এখন সামনের দিকে এগোও।"

সুমন সামনের দিকে এগোতে থাকল। একটু এগনোর পরই সামনে একটা দেওয়াল পড়ল। মাদাম বলল, "এবার ওই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।"

দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক আগের মতো এই দেওয়ালটিও একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। তবে সতর্ক ছিল বলে সুমন নিজেকে সামলে নিল, পড়ে গেল না। সে দেখল, একটা বড় ঘরের মধ্যে রয়েছে। ঘরটার মাঝ বরাবর একটা ভারী পরদা টাঙানো। তার এপাশে একটা চেয়ার পাতা। মাদাম দুভলভে বলল, "এবার ওই চেয়ারে বসে পড়ো।"

সুমন বলল, "বসছি। কিন্তু মাদাম, আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই একইভাবে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। অথচ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কী করে বুঝতে পারছ, আমি ঠিক কখন কোথায় আছি? এই যে তুমি এক্ষুনি আমাকে বললে ওই চেয়ারে বসতে। তুমি জানলে কী করে আমি এই মুহূর্তে ওই চেয়ারের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।"

মাদাম বলল, "যখন ঘরে তোমার উপর আলট্রাগ্রিন রশ্মি প্রয়োগ করে তোমাকে ছোট করে ফেলা হচ্ছিল আর তোমার শরীরের রোমকূপ দিয়ে ছোট-ছোট আয়রন পার্টিক্‌ল ঢোকানো হচ্ছিল, তখন আরও একটা ব্যাপার করা হয়েছে। তোমার দু' কানের মধ্যে দিয়ে দু'টো অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপিক বায়োফিডব্যাক ক্যামেরা ঢুকিয়ে দু' চোখের মণিতে সেগুলো লাগানো হয়েছে। ফলে তুমি যখন যা দেখছ, আমিও আমার পর্যবেক্ষণ কক্ষের পরদায় তা দেখতে পাচ্ছি। এ ছাড়া তোমার মাথার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম মাইক্রোফোনিক চিপ বসানো হয়েছে, যা দিয়ে তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। আমিও তোমার মনে-মনে বলা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি। এবার আর কথা না বাড়িয়ে ওই চেয়ারে বসে পড়ো। আমাদের এই জগতের চিফ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

সুমন চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "ও বাবা, আমি তো এতক্ষণ তোমাকেই এই জগতের চিফ ভাবছিলাম। তুমি তা হলে কে?"

মাদাম একটু হেসে বলল, "আমাকে তুমি পৃথিবীর পদাধিকার অনুযায়ী জনসংযোগ আধিকারিক ভাবতে পার। যদিও আমাদের এখানে পদের কোনও নামকরণ হয় না। সকলকেই অল্পবিস্তর সবরকম কাজ জানতে হয়। এবার চুপ করো। এখনই আমাদের চিফ পরদার ওপাশে এসে বসবে।"

সুমন সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, পরদার ওপাশে একটা জোরাল আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "হ্যালো সুমন!"

সুমন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "হ্যালো স্যার।"

গম্ভীর কণ্ঠস্বরটি বলল, "আমাকে 'স্যার' বলতে হবে না। আমার নাম নিউস্টাইন। তুমি আমাকে নাম ধরেই ডেকো। আমাদের এখানে সকলে সকলকেই নাম ধরে ডাকে এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। কেউ কাউকে 'স্যার' বলে না, বুঝলে?"

সুমন মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি স্যা... না মানে নিউস্টাইন। কিন্তু এটা এখনও বুঝতে পারিনি, তোমরা কারা, আর আমাকেই বা এখানে নিয়ে এসেছ কেন? মাদাম দুভলভেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু ও কিছুই বলেনি।"

নিউস্টাইন বলল, "তোমার এই কথাটা মানতে পারলাম না। মাদাম দুভলভে কিন্তু তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। তবে এই প্রশ্ন দু'টোর জবাব আমি দেব। এই যে জগৎটা দেখছ, এটা প্রাথমিকভাবে আমারই সৃষ্টি। পরে অবশ্য অনেকে এটাকে ডেভেলপ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তুমি তো জানো, পৃথিবীতে কেউ মারা গেলে তাকে হয় সমাধি দেওয়া হয়, নয় তার শরীরটাকে পুড়িয়ে সেই ছাই মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বা জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে শরীরের সমস্ত

বিশিষ্ট অভিধানকার
সুভাষ ভট্টাচার্যের
বিবিধ বিদ্যার অভিধান
বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার-২০০৭
A Dictionary of English PHRASES and IDIOMS
প্রতিটির অর্থ ইংরেজি ও বাংলায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে
মূল্য : ১৫০
ব্যাকরণের আনন্দপাঠ
ছোটো-বড়ো সকলের জন্য ব্যাকরণকে বুঝতে আর ভালোবাসতে শেখার বই
মূল্য : ৫০
দে বুক কনসার্ন
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

উপাদান ধীরে-ধীরে পৃথিবীর গভীরে চলে যায় এবং অনন্তকাল সেখানে থাকে। কখনও-কখনও এক ব্যক্তির শরীরের কোনও উপাদান অন্য কোনও ব্যক্তির শরীরের উপাদানের সঙ্গে মিশে যায়।

এরকমভাবেই একদিন আইজাক নিউটন আর অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের শরীরের ইনটেলেকট্রিক মাইক্রো এলিমেন্ট মিশে আমার সৃষ্টি। এই দুই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। সৃষ্টির পর মাটি থেকে জীবনধারণের সব রসদ সংগ্রহ করে ধীরে-ধীরে নিজেকে তৈরি করেছি। যেহেতু সাধারণ মানুষের তুলনায় আমার মাথা অনেক গুণ উর্বর, ফলে এই জগৎ সৃষ্টি করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। শুধু আমি কেন, এই জগতের প্রত্যেকেই প্রথমে এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পর প্রত্যেকের মাথায় পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত তথ্য, এই যেমন ধরো, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষা ইত্যাদি দিয়ে ফিল করা অতি সূক্ষ্ম চিপ বসানো হয়েছে। তবে প্রত্যেকেই যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর শরীরের এলিমেন্ট থেকে তৈরি তা নয়। এখানে বিখ্যাত সব অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পীর শরীরের ইনটেলেকট্রিক মাইক্রো এলিমেন্ট থেকে সৃষ্ট ব্যক্তিরাও রয়েছেন।"

সুমন জানতে চাইল, "এই ইনটেলেকট্রিক মাইক্রো এলিমেন্টটা কী জিনিস?"

নিউস্টাইন বলল, "তুমি তো জানোই, যে-কোনও জিনিসই অসংখ্য পরমাণু বা অ্যাটম দিয়ে তৈরি। এই অ্যাটমের মধ্যে তিনটি আদি কণা থাকে, প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন। যেসব মানুষের ট্যালেন্ট, ইনটেলিজেন্স বা ইনটেলেক্ট-এর মধ্যে কিছু না-কিছু অসাধারণত্ব থাকে, তাদের শরীরের মাইক্রো এলিমেন্টের ইলেকট্রনের মধ্যে এই বিশেষ গুণগুলোর সঞ্চার হয়। সেইসব মানুষের মৃত্যুর পরও ওই মাইক্রো এলিমেন্টের মধ্যে এই গুণগুলো বজায় থাকে। একেই বলা হয় ইনটেলেকট্রিক মাইক্রো এলিমেন্ট। মৃত্যুর পর সেইসব মানুষের শরীরের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এই বিশেষ গুণসম্পন্ন ইনটেলেকট্রিক মাইক্রো এলিমেন্টও মাটিতে মিশে যায়। বুঝতে পেরেছ?"

সুমন বলল, "হ্যাঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল। এবার বলো, আমাকে নিয়ে এসেছ কেন?"

নিউস্টাইন বলল, "প্রধানত চিত্রশিল্পীদের অনুরোধেই তোমাকে আনা হয়েছে। এখানে এক-একজন চিত্রশিল্পীর শরীরে দুই বা তারও বেশি বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের এলিমেন্ট রয়েছে। এই যেমন, আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে একজন চিত্রশিল্পী রয়েছে যার মধ্যে ভ্যান গঘ, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আর রেমব্রান্টের শরীরের এলিমেন্ট আছে। এর নাম লিনগন্ট। এই শিল্পীরা জীবিত থাকাকালীন পৃথিবীতে এককভাবে যেসব শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনায় লিনগন্ট এখন যেসব কাজ করছে সেগুলো অনেক-অনেক উচ্চমানের। এই তিনজন শিল্পীর সেরা গুণগুলো একসঙ্গে করলে যা হয়, তারই প্রতিফলন ঘটছে লিনগন্টের কাজে। ও তোমাকে কিছু কথা বলতে চায়।"

সুমন উৎসাহিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে খুবই আগ্রহী। আমার স্বপ্নের চিত্রকরদের সঙ্গে কথা বলতে পারব এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

পরদার ওপাশ থেকে আর-একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কী সুমন? তোমার ছবি আঁকা কেমন চলছে? রঙের অভাবে 'মডার্ন টাইমস' ছবিটা শেষ করতে পারলে না তো?"

সুমন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জানলে কী করে?"

লিনগন্ট বলল, "এক বছর ধরে আমরা তোমার অজান্তে তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছি। সারা পৃথিবীতে তো অনেক চিত্রশিল্পী আছে, কিন্তু পর্যবেক্ষণের জন্য তোমাকে বেছে নেওয়ার পিছনেও একটা কারণ আছে। চিন্তাধারায় তুমি ছাড়া অন্য শিল্পীরা অনেক-অনেক পিছনে পড়ে। হয়তো ব্যবহারিক জীবনে তাদের অনেকেই তোমার চেয়ে বেশি বিখ্যাত, কিন্তু চিন্তাভাবনায় তুমি তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আমাদের ভাবনার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে একমাত্র তোমার ভাবনার তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরই কিছুটা মিল আছে। তাই তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। দ্যাখো, আমরা সবসময়ই চাই পৃথিবীতে অসাধারণ সব শিল্পকর্মের সৃষ্টি হোক। কিন্তু ইদানীং লক্ষ করছি, শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে সেভাবে নতুন-নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে না। ব্যাপারটা আমাদের সব চিত্রশিল্পীকেই খুব নাড়া দিচ্ছে। তাই তোমাকে এখানে নিয়ে আসা। আমরা তো সরাসরি পৃথিবীর উপরিতলে গিয়ে এই ব্যাপারে কোনও ভূমিকা নিতে পারব না। তোমাকে আমাদের কিছু কাজ দেখাব এবং কিছু কাজ শেখাব, যাতে তুমি পৃথিবীর উপরিতলে ফিরে যাওয়ার পর শিল্পের জগতে নতুন মোড় আনতে পার। তুমি কি আগ্রহী?"

সুমন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে।"

লিনগন্ট তখন বলল, "বেশ, তা হলে বাঁ দিকের ঘরে যাও, আমিও আসছি।"

সুমন চেয়ার থেকে উঠে বাঁ দিকের ঘরের ভিতরে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। বিশাল বড় ঘরটায় বড়-বড় ছবি টাঙানো, বিভিন্ন ভাস্কর্য রাখা, ইজেল, ক্যানভাস, রং-তুলি আরও কত কী। মোহিত হয়ে সে সেইসব কাজ দেখতে লাগল, আর ভাবল, এইরকম উন্নতমানের শিল্পকর্ম এককভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। পিছন দিক থেকে খুট করে একটা শব্দ হওয়ায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিছন ফিরে সে আঁতকে উঠল। দেখল, তার প্রায় ঘাড়ের কাছে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। সুমন ভয় পেয়ে পিছু হটতে শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা বলল, "ভয় পেও না, আমি লিনগন্ট।"

সুমন একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, "ও তুমি। তা তুমি এরকম কালো কাপড়ে নিজেকে মুড়ে রেখেছ কেন?"

লিনগন্ট বলল, "তোমার ভালর জন্য। শুধু আমি একা নই, আমাদের মধ্যে যাকেই তুমি সামনাসামনি দেখতে পাবে, তাকে ঠিক এইভাবেই দেখবে।"

সুমন অবাক হয়ে বলল, "কেন? কী কারণে?"

লিনগন্ট বলল, "বললাম তো তোমার ভালর জন্য। আমাদের সরাসরি দেখলে তুমি ভয় পেতে পার। আমরা তোমাদের মতো তো সুন্দর নই।"

সুমন বলল, "কী যে বলো? আমরা সকলেই কি দেখতে সুন্দর নাকি?"

গল্প

লিনগন্ট বলল, "সুন্দর বলতে আমি বোঝাতে চাইছি অবিকৃত শরীর। এখানে সকলের মাথা অত্যন্ত উন্নত কিন্তু শরীর বিকৃত, কুৎসিত, খানিকটা আবার যান্ত্রিকও। সেই শরীর তোমার না দেখাই ভাল।"

সুমনের জেদ চেপে গেল, "তবু আমি দেখতে চাই।"

লিনগন্ট বলল, "বেশ, আমি তোমাকে কথা দিলাম, তোমার জগতে ফিরে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে আমার আসল চেহারা দেখাব।"

সুমন বলল, "বেশ! কিন্তু কথাটা ভুলে যেও না যেন!"

লিনগন্ট হেসে বলল, "না না, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। চলো, এবার বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক। তোমাকে আমাদের কাজগুলো ভাল করে দেখাই।"

সুমন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।"

ঘরের একপ্রান্ত থেকে তারা কাজগুলো দেখতে শুরু করল। সুমন বলল, "ছবিগুলো এত উঁচুতে টাঙানো যে, খুব খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে না। তোমাদের উচিত ছিল, ছবিগুলো আর-একটু নীচে টাঙানো।"

লিনগন্ট হেসে বলল, "ও এই কথা, তা আগে বলবে তো! নাও, তোমার সমস্যার সমাধান করে দিলাম।"

এই বলে দরজার কোনায় আটকানো একটা লিভারে টান দিতেই ঘরটার দেওয়ালগুলো নীচের দিকে নেমে ঘড়ঘড় শব্দ করে মাটির মধ্যে খানিকটা ঢুকে গেল। এর ফলে ছবিগুলো খানিকটা নেমে এল। সুমন হতবাক হয়ে গেল এসব দেখে। লিনগন্ট বলল, "এই ছবিটা দেখেছ? এটা আমার আঁকা। আর পাশের ছবিটা মানোজার আঁকা।"

সুমন জিজ্ঞেস করল, "মানোজার মধ্যেও নিশ্চয়ই বিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীর শরীরের এলিমেন্ট রয়েছে, তাই না?"

লিনগন্ট বলল, "অবশ্যই। ওর মধ্যে আছে মাতিস, রেনোয়া আর পল সেজানের শরীরের ইনটেলেকট্রিক মাইক্রো এলিমেন্ট।"

দেওয়ালের পাশে মেঝের উপর বেশ কয়েকটা অসাধারণ ভাস্কর্য রাখা ছিল। সুমন জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কাদের তৈরি?"

লিনগন্ট বলল, "এই সবক'টা ভাস্কর্যই রোঙ্কর-এর তৈরি। রোঙ্করের মধ্যে আছে রঁদা আর রামকিঙ্কর বেজের শরীরের এলিমেন্ট। বুঝলে?"

এইভাবে ঘুরে-ঘুরে লিনগন্ট সুমনকে বিভিন্ন শিল্পীর কাজ দেখাতে থাকল এবং তার পরিচয় দিতে থাকল। ওই ঘরের সব কাজ দেখা হয়ে যাওয়ার পর লিনগন্ট সুমনকে জিজ্ঞেস করল, "কী সুমন, আরও কাজ দেখতে চাও?"

সুমন বলল, "নিশ্চয়ই। আমি তোমাদের সব কাজ দেখতে চাই। কীভাবে তোমরা কাজ করো তাও জানতে চাই।"

লিনগন্ট বলল, "বেশ, তা হলে আমাদের ওয়ার্কশপে চলো। সেখানে তোমাকে কিছু কাজও শেখানো হবে।"

সুমনকে নিয়ে ঘরের কোনায় ছোট্ট দরজাটা দিয়ে ভিতরে গেল লিনগন্ট। ঘরে ঢুকে সুমন দেখল, সে যেন একটা যন্ত্রের মধ্যে ঢুকেছে। তখন সে লিনগন্টকে জিজ্ঞেস করল, "এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে? তুমি যে আমাকে বললে তোমাদের ওয়ার্কশপে নিয়ে যাবে?"

লিনগন্ট বলল, "আমাদের ওয়ার্কশপটা এখান থেকে অনেক দূরে। হেঁটে গেলে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে এই যানে করে গেলে কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে যাওয়া যাবে। চলো, আমরা ওই সিট দু'টোয় বসি। সিটবেল্টটা বেঁধে নাও।"

তারা দু'জনে সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিল। লিনগন্ট যানের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর সিটের হাতলের উপরের সুইচটা টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল ঝাঁকুনি শুরু হল, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। যানটি একদম স্থির হয়ে যাওয়ার পর লিনগন্ট সিটবেল্ট খুলে উঠে পড়ল। দেখাদেখি সুমনও তাই করল। দরজা খুলে যান থেকে বেরিয়ে সুমন একদম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। দেখল, তারা একটা বিশাল হলঘরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই ঘরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চার-পাঁচজন, যেন কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তি, কাজ করছে। কেউ স্কেচ করছে, কেউ ক্যানভাসের উপর রং-তুলি নিয়ে কাজ করছে, কেউ আবার স্কাল্পচার তৈরি করছে। সুমন মোহিত হয়ে ওদের কাজ দেখতে লাগল। লিনগন্ট বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে সুমনের পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের কাজ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করল। সুমন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোমরা এই যে রং ব্যবহার করছ, এই কোয়ালিটির রং তোমরা কোথায় পাও? আমাদের জগতে তো এত ভাল রং পাওয়া যায় না।"

লিনগন্ট হেসে বলল, "কেন? সূর্য থেকে।"

সুমন অবাক হয়ে বলল, "মানে? তোমরা তো থাকো পৃথিবীর কেন্দ্রে। সূর্যের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী?"

লিনগন্ট বলল, "আমরা পৃথিবীর উপরিতলে বিভিন্ন জায়গায় খুব ছোট-ছোট সোলারস্কোপ বসিয়েছি।"

সুমন বলল, "সোলারস্কোপ! সেটা আবার কী?"

লিনগন্ট বলল, "জিনিসটা দেখতে অনেকটা তোমাদের পেরিস্কোপের মতো। যন্ত্রটার উপরের অংশ থাকে পৃথিবীর উপরিতলে, আর শেষ অংশ থাকে পৃথিবীর কেন্দ্রে, মানে আমাদের এখানে। মোট সাতরকম সোলারস্কোপ আছে। এক-একটি সোলারস্কোপে সূর্যের সাত রঙের রশ্মি থেকে এক-একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিকে শুষে নেওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই শোষিত রশ্মি সোলারস্কোপের মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে পৌঁছনোর পর তার সঙ্গে কিছু বায়োকেমিক্যাল পদার্থ মিশিয়ে আমাদের এই রং তৈরি হয়। এই রঙের ঔজ্জ্বল্য কোনও দিন কমে না। এসো, তোমাকে আরও একটা জিনিস দেখাই।"

ঘরটার একদিকের দেওয়ালে আটকানো একটা মেশিনের কাছে লিনগন্ট সুমনকে নিয়ে গেল। সুমন বলল, "আরে! এই মেশিনটা তো অনেকটা আমাদের ব্যাঙ্কের এটিএম-এর মতো দেখতে।"

লিনগন্ট বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটার কাজও খানিকটা ওইরকম। এর নাম এবিএম, মানে স্বয়ংক্রিয় ব্রাশ মেশিন। এই মেশিনটা টাচস্ক্রিন প্রযুক্তিতে চলে। এতে বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে, ফ্ল্যাট ব্রাশ না রাউন্ড ব্রাশ, কত নম্বরের ব্রাশ, সবরকম ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করিয়ে বোতাম টিপলেই রেডিমেড ব্রাশ বেরিয়ে আসবে। আদার্স অপশনে গিয়ে নিজের

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি।
১৫ টাকা

মহাশ্বেতা দেবীর আশ্চর্য বই
তুতুল ২৫ টাকা

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
১৫ টাকা
লেখকের আরেকটি বই চড়ুইয়ের সঙ্গে ১৫ টাকা

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ৩০ টাকা

ছোটদের নতুন বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী অনূদিত

নীল পাহাড় পেরিয়ে
মোঙ্গোলিয়ার বিখ্যাত কবির লেখা আধুনিক রূপকথা। পাতায় পাতায় মোঙ্গোলিয়ার রঙিন ছবি। ৬০ টাকা

নেকড়ের চোখ
দানিয়েল পেনাক
মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ:
মৈত্রেয়ী নাগ ৬০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। পঞ্চম মুদ্রণ। ৪০ টাকা
‘গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।’ —মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল।

পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প

হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪৫ টাকা

শাদা ঘোড়া
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনূদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ৩০ টাকা

ঋষিকুমার ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান। ২০ টাকা

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৪০ টাকা

ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প। ৫০ টাকা

লেখকের ছোটদের আরও বই
পাখির খাতা ২০ টাকা টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ১৫ টাকা
তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা আমার বনবাস ১২ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা ১৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট) ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19
Phone: 2283-2320, 2290-0008

পছন্দমতো ব্রাশ ক্রিয়েটও করা যায়। অর্থাৎ যে নম্বরের বা যে স্টাইলের কোনও ব্রাশ এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি, দরকার মতো তাও তৈরি করে নেওয়া যায়। এ সুবিধে তোমাদের জগতে নেই। সেই চিরাচরিত একই রকমের ব্রাশ দিয়ে তোমাদের কাজ করতে হয়। তা ছাড়া ছবিতে বা স্কাল্পচারে এমন অনেক উপাদান আমরা ব্যবহার করি, যা সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। যদিও তার অনেকটাই এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক। যেমন ধরো, গত কালই আমি ট্রান্সপারেন্ট শিটের উপর বিভিন্ন রঙের ট্রান্সপারেন্ট মেটালের গুঁড়ো আটকে একটা নতুন ধরনের কাজ করেছি। ছবিটা যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট, তাই একটা স্পেসিফিক অ্যাঙ্গেল থেকেই ওটাকে দেখা যাবে। কিন্তু ছবিটার সামনে দাঁড়ালে কিছুই বোঝা যাবে না।

আমরা চাই এইরকম কিছু টেকনিক শিখে তুমি তোমাদের জগতে ফিরে যাও আর সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করো। আমি জানি, তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে। তোমাকে হাতে ধরে কিছু শেখানোর দরকার নেই। তুমি ঘুরে-ঘুরে সকলের কাজ দ্যাখো। দেখবে প্রত্যেকেই নতুন-নতুন কিছু না-কিছু কাজ করছে। প্রত্যেকের কাজ খানিকক্ষণ দ্যাখো। তারপর সেই স্টাইলটা কাজে লাগিয়ে তার সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা মিশিয়ে নতুন সৃষ্টির চেষ্টা করো। কখনও কোথাও কোনও অসুবিধে হলে যে-কারও কাছে সাহায্য চাইতে পার। আমরা প্রত্যেকেই শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত। নাও, এবার তোমার কাজ শুরু করো। আমিও একটা নতুন কাজে বসি।"

সুমন প্রত্যেকের কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাদের কাজ দেখতে লাগল। কোনও ব্যাপার বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে জেনে নিল। প্রত্যেকে খুব যত্ন করে তাকে বুঝিয়েও দিল। এইভাবে অনেক নতুন পদ্ধতি, নতুন কনসেপশন সুমন শিখে নিল। তারপর সে লিনগন্টকে বলল, "আমি এবার নিজে কিছু কাজ করতে চাই। আমার মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এসেছে। সেই আইডিয়ার সঙ্গে তোমাদের কাছে শেখা আইডিয়া মিলিয়ে আমি একটা ছবি আঁকতে চাই। আমি কি তোমাদের ওয়ার্কশপের জিনিস ব্যবহার করতে পারি?"

লিনগন্ট বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

সুমন তখন এবিএম থেকে নিজের দরকার মতো ব্রাশ আর ওয়ার্কশপের মেঝে থেকে একটা ত্রিকোণ মেটাল প্লেট তুলে নিল। এবার সূর্যরশ্মি থেকে তৈরি রং দিয়ে সে ওই মেটাল প্লেটের উপর নিজের চিন্তাভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করল। ছবিটা আঁকতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে সুমনের মধ্যে এমন একটা ঘোর কাজ করতে লাগল। ছবিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুমন ছবি থেকে মাথাই তুলতে পারল না। ছবিটা শেষ করার পর মাথা তোলার আগেই অনুভব করল, বেশ কয়েকজন চারপাশে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে। মাথা তুলে চারপাশে তাকিয়ে সে আঁতকে উঠল। দেখল, কদাকার, বীভৎস, বিকৃত, আবার কিছুটা যান্ত্রিক চেহারার কয়েকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমি লিনগন্ট। তোমার ছবিটা খুব সুন্দর হয়েছে।"

সুমন ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরল, দেখল, সে তার ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে। সুমন ভাবল ওঃ, তা হলে এটাও একটা স্বপ্ন ছিল! ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেখল, ঘড়িতে চারটে দশ বাজে। ঘরের কোনায় রাখা অসমাপ্ত ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ক্যানভাসটা আর অসমাপ্ত নয়। সে ঠিক যেভাবে ছবিটা শেষ করতে চেয়েছিল, সেভাবেই ছবিটা শেষ করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ছবিটার ঘড়িতেও এখন চারটে দশ বাজে। অথচ তার স্পষ্ট মনে আছে, সে ছবিটা আঁকার সময় ঘড়িতে তিনটে চল্লিশ বেজেছিল। সে ভাবল, এটা কী করে সম্ভব? অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা কিছুতে হোঁচট খেয়ে সুমন হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে নিজেকে কোনও মতে সামলে নিল। কিসে হোঁচট খেয়েছে দেখতে গিয়ে সুমন দেখল, মেঝের উপর পড়ে রয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রে বসে আঁকা তার সদ্যসমাপ্ত ত্রিকোণ মেটাল প্লেটটা। যার রং এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি।

ছবি: উজ্জ্বল গোস্বামী

মায়াবিনী মায়র্কা

বালেরিক দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ মায়র্কা, স্পেনের সবচেয়ে সুন্দর দেখার জায়গাগুলোর মধ্যে একটি। লিখেছেন **অনিন্দ্যকান্তি মজুমদার**

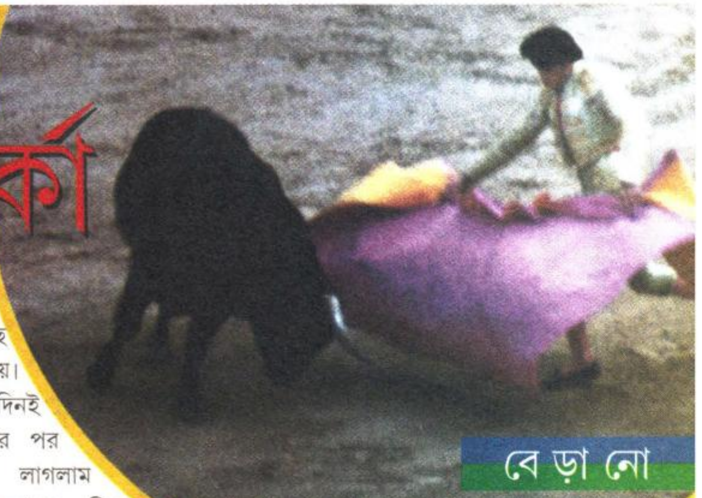

মাতাদোর এবং ষাঁড়ের লড়াই

ভূমধ্যসাগরের নীলাম্বরীর উপর ছড়ানো কয়েকটি পান্না — স্পেন অধিকৃত বালেরিক দ্বীপপুঞ্জ! তারই সবচেয়ে বড় দ্বীপ মায়র্কা, যার প্রধান শহর পালমা। আমি সেই সময় জার্মানিতে কাজ করছি। আমার এক বন্ধু, হান্স এসে বলল, "চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।"

যথারীতি বুকিং হয়ে গেল। যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম ডুসেলডর্ফ এয়ারপোর্টে। প্লেনটি ডাকোটা! শুনেছিলাম এটা খুব শক্ত প্লেন। কত শক্ত, তার প্রমাণ যে শিগগিরই পাব, বুঝতে পারিনি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু পরেই শুরু হল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলল এই তাণ্ডব। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এমন সময় ঝাঁকুনি কমে এল। কিছুক্ষণ পরে মেঘ কাটিয়ে, প্লেন বেরিয়ে এল পরিষ্কার আকাশের নীচে। এ যাত্রা তা হলে বেঁচে গেলাম। পালমা বিমানবন্দরে নামার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম সকলে।

পালমা শহরের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাস চলল। রাস্তার দু' পাশে পাম গাছের সারি, তাই শহরের নাম 'পালমা'। শহর শেষ হতে, পথ চলল সমুদ্রের তীর দিয়ে। ডান হাতে সমুদ্রের ঘন নীল জল, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট বসতি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম। সেদিন শরীর আর মনের উপর এত ধকল গিয়েছিল যে, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেল। চোখ খুলতেই দেখলাম ব্যালকনি রোদে ভেসে যাচ্ছে। কতদিন এরকম দৃশ্য দেখিনি! জার্মানিতে তো রোদের মুখই দেখা যেত না। উপরে ছোট্ট একটা টেবিলে প্রাতরাশ এসে গেল। খাওয়া শেষ করে হান্সকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জায়গাটা ভাল করে দেখতে।

রাস্তা দিয়ে একটু এগোতেই বাঁ দিকে দেখা গেল সমুদ্রের ঘন নীল জল, অগভীর স্থানগুলো আবার সবুজ। তারই মধ্যে কিছু-কিছু সমতল জায়গা, বালিতে ঢাকা। সমুদ্র হলে কী হবে, ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের গঙ্গায় এর চেয়ে বেশি ঢেউ ওঠে। তবে জল খুব ভারী, বিনা চেষ্টাতেই ভেসে থাকা যায়। অনেকে দেখলাম চোখে একরকম রোদচশমা পরে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। শুনলাম, ওটার নাম 'স্নর্কেল', ওটা পরে থাকলে জলের নীচের দৃশ্য ভাল দেখা যায়। পায়ে ফ্লিপার লাগিয়ে দেখলাম, পরিষ্কার স্বচ্ছ জল, চশমা দিয়ে নীচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নানারকমের নানা বর্ণের মাছ ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে প্রবাল নেই, আছে নানারকম উদ্ভিদ। কাঁকড়াও দেখলাম। এই দৃশ্য দেখে কেটে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবে বড় কোনও মাছ চোখে পড়ল না। একবার কয়েক পলকের জন্য একটা রে মাছ জলের মধ্যে ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

বাঙালির ছেলে। যতদিন ওখানে ছিলাম, দু'-বেলা শুধু নানারকমের সামুদ্রিক মাছই খেয়েছি। অনেকরকম মাছ খেলেও চিংড়িমাছ পেলাম না। রেস্তরাঁর মালিক বললেন যে, এখান থেকে পাঁচ-ছ' কিলোমিটার দূরে একটা বিচ রেস্তরাঁয় সবসময় চিংড়িমাছ পাওয়া যায়। পরের দিনই ব্রেকফাস্টের পর হাঁটতে লাগলাম চিংড়ির সন্ধানে। বিচে নেমে দেখি রেস্তরাঁটা ডাঙায় নয়, জলে। কয়েকটা খুঁটি জলের নীচে পোঁতা, তার উপরে কাঠের পাটাতন, খড়ের ছাদ। ডাঙা থেকে পৌঁছনোর জন্য ওরকমই সরু রাস্তা। রেলিং দিয়ে অনেক দড়ি বাঁধা ছিল, তার একটা ধরে টানতেই জলের নীচ থেকে উঠে এল একটা ঝুড়ি, তার মধ্যে ভর্তি চিংড়িমাছ, তখনও সব জ্যান্ত। চিংড়িগুলো কেটে সাফ করে একটু নুন মাখিয়ে মাখনে ভেজে দিল রেস্তরাঁর মালিক। কী অপূর্ব খেতে হয়েছিল কী বলব! এরই মধ্যে আমাদের যাত্রীগোষ্ঠীর কর্ণধার এসে জানালেন যে, পালমা শহরে বুল-ফাইটের অনুষ্ঠান হবে। যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম, ক্যামেরা সমেত। বিশাল স্টেডিয়াম, লোকে লোকারণ্য, সকলেই বেশ উত্তেজিত। একটু পরেই শিঙা বেজে উঠল আর বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব খেলোয়াড় ঢুকল মিছিল করে। আজকের করিডাতে (খেলা) যথারীতি তিনজন টোরেরো (প্রধান যোদ্ধা) থাকবে আর সংহার হবে ছ'টি বৃষ। হঠাৎ স্টেডিয়ামের একটা দরজা খুলে গেল আর তিরবেগে বেরিয়ে এল ঘোরকালো এক ষাঁড়। বাপরে কী প্রকাণ্ড ষণ্ড, আমাদের দেশের ষাঁড় এর তুলনায় নিতান্ত ছোট। দর্শকরা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল "টোরো, টোরো," অর্থাৎ ষাঁড়। কয়েকবার মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ষাঁড়কে দৌড় করাল সহকারীর দল। তারপরে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন স্বয়ং টোরেরো (এদের 'মাতাদোর'ও বলা হয়)। পরনে রঙিন আঁটসাঁট পোশাক, হাতে একটা কাপড় (কেপ), তার একদিকের রং ম্যাজেন্টা, অন্যদিকে হলুদ। পা দাপিয়ে হাতের কাপড় নেড়ে টোরেরো আস্ফালন করল ষাঁড়কে। সে সবেগে আক্রমণ করল, কিন্তু লক্ষ্য ওই কাপড়ের দিকেই। টোরেরো কেপ সরিয়ে নিল আর ষাঁড়টা তার গা ঘেঁষে চলে গেল, সে একচুলও নড়ল না নিজের জায়গা থেকে। কিছুক্ষণ এইভাবেই চলল, ষাঁড় তেড়ে আসে, টোরেরো নানা কায়দায় কেপ ঘুরিয়ে তাকে বিফল করে দেয়, আর দর্শকরা চেঁচায় 'ও-লে'। আমি সারাক্ষণ ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে বসে থাকলাম। অনেক ফোটো তুললাম। সেসব এখনও আছে। পরের দিন ফেরত-যাত্রা, বিমানবন্দরে যাওয়ার বাস এসে গেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসে উঠলাম। আবারও সেই ডাকোটা। তবে এবারের উড়ান নির্বিঘ্নে কেটে গেল। মায়র্কার রোদ-ঝলমলে তটভূমি স্বপ্নের মতো গাঁথা হয়ে থাকল মনে।

ফোটো: লেখক

ঝনঝন প্রাসাদের ছায়ামূর্তি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

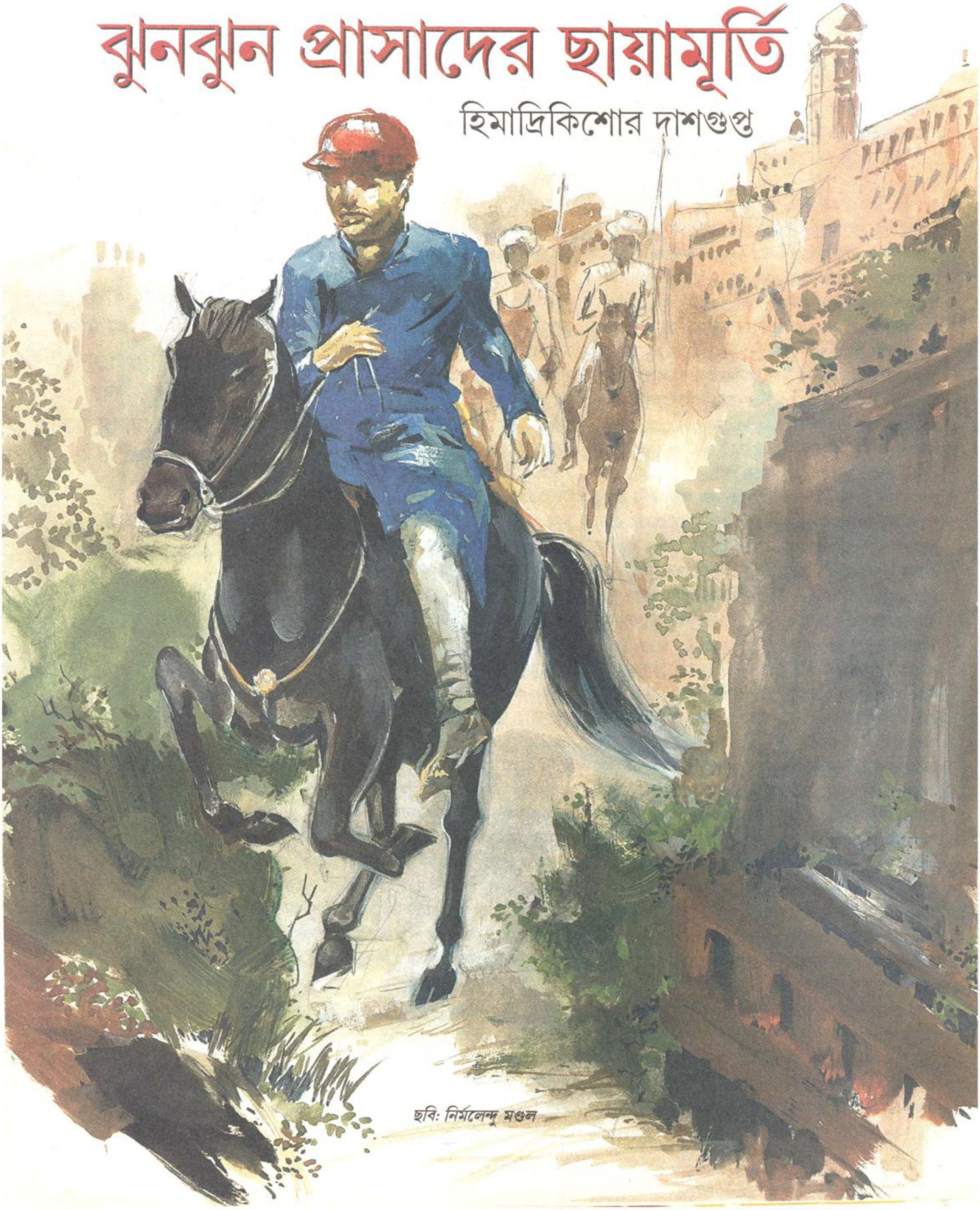

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

"ওটাই কি চিতোরগড়?" প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড়ের মাথায় থাকা কেল্লাটা দেখিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল অনিকেতকে।

অনিকেত তাকিয়ে ছিল সেদিকে। সূর্যের আলোয় ভোরের কুয়াশা কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছে এক প্রাচীন কেল্লার চেহারা। অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, ওটাই হবে। কত শুনেছি ওই কেল্লার গল্প! দূর থেকে দেখেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হচ্ছে। ভাল করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হবে। রাজপুতদের সংগ্রামের ইতিহাস প্রায় সবটাই ওই কেল্লাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।"

পার্থ বলল, "সত্যি, কেল্লাটা দেখে তোর মতো আমারও রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

অনিকেত হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে ছ'টা বাজে। পার্থকে বলল, "চল, এবার প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাওয়া যাক। বাইরে বেরিয়ে আগে টিফিন করে নেব, তারপর একটা হোটেল খুঁজে সেখানে স্নান করে কেল্লা দেখতে যাব।"

পার্থ মাটিতে নামিয়ে রাখা সুটকেসটা তুলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ চল, এবার এগনো যাক।"

দু'জনে হাঁটতে শুরু করল প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাওয়ার জন্য। গত কাল রাতে জয়পুর থেকে লেকসিটি এক্সপ্রেস ধরে, ভোররাতে চিতোরগড়ে এসে পৌঁছেছে। দু'দিন চিতোরে থেকে উদয়পুরে চলে যাবে। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে ক'দিন আগে এবং তারপরেই কলকাতা থেকে রাজস্থান বেড়াতে এসেছে তারা। তবে সম্পূর্ণ রাজস্থান নয়, এ যাত্রায় জয়পুর, চিতোরগড়, উদয়পুর, এই কয়েকটা জায়গা তারা ভাল করে ঘুরতে চায়।

নিজেদের লাগেজ নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনের চত্বরটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। তার শেষ মাথায় বেশ কিছু দোকানপাট চোখে পড়ল ওদের। টুরিস্ট সিজন হলেও প্ল্যাটফর্মের বাইরে খুব বেশি লোকজন চোখে পড়ল না। বেশিভাগ টুরিস্টই বাসে চেপে কন্ডাকটেড টুরে রাজস্থানে আসে। তাই এই ছোট-ছোট স্টেশনে তেমন ভিড় থাকে না। চত্বরটার একপাশে বেশ কয়েকজন টাঙাওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল। অনিকেতরা প্ল্যাটফর্মের বাইরে পা রাখতেই তারা ছুটে এসে ঘিরে ধরল দু'জনকে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনিকেত বলল, "টাঙা তারা নেবে না, তাদের নিতে লোক আসবে।"

টাঙাওয়ালারা ফিরে যাওয়ার পর অনিকেত পার্থকে চত্বরের শেষ মাথার দোকানগুলো দেখিয়ে বলল, "ওখানে নিশ্চয়ই খাবারের ব্যবস্থা আছে, আগে খেয়ে নিই। তারপর কাছাকাছি কোনও হোটেল বা ধর্মশালা খুঁজব। না পাওয়া গেলে তখন না হয় টাঙা নিয়ে হোটেল খুঁজব।"

পার্থ বলল, "ঠিক আছে।"

চত্বরটা পেরিয়ে দোকানগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা খাবারের দোকান চোখে পড়ল। দোকানের সামনে বিরাট কড়াইতে পুরি ভাজা হচ্ছে। ঘিয়ের গন্ধে ম-ম করছে তার চারপাশ। দু'জনে গিয়ে ঢুকল দোকানের ভিতর। কাঠের চেয়ার-টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে বেশ কয়েকজন খাচ্ছে। পোশাক দেখে মনে হয় তারা স্থানীয় মানুষ। অনিকেতরা একটা টেবিলে বসে চারটে করে পুরি আর চায়ের অর্ডার দিল। দোকানের লোক খাবার দিয়ে যাওয়ার পর খেতে-খেতে পার্থ অনিকেতকে বলল, "দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা এখনও খুব বেশি ডেভেলপ করেনি। চারপাশ বেশ ফাঁকা-ফাঁকাই আছে। স্টেশন চত্বর, অথচ বড়-বড় বাড়ি-ঘর নেই।"

অনিকেত বলল, "আমার তো মনে হয় এরকমই ভাল। ঐতিহাসিক জায়গাগুলোয় আকাশচুম্বী চোখ ধাঁধানো বাড়ি-ঘর থাকলে স্থানমাহাত্ম্য কেমন যেন নষ্ট হয়ে যায়। পুরনো-পুরনো গন্ধটা ঠিক পাওয়া যায় না।"

পার্থ বলল, "তবে টুরিস্ট যখন আসে তখন বড় হোটেলটোটেল নিশ্চয়ই এখানেও আছে।"

অনিকেত বলল, "তা তো বটেই, সেগুলো হয়তো কেল্লার কাছাকাছি বা অন্য কোথাও হবে।"

এর পর অনিকেত গরম চায়ের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "যদি হোটেল বা ধর্মশালায় না থেকে কেল্লার ভিতর রাত কাটানো যায়, তা হলে দারুণ হয়। আমার পরিচিত একজন একবার রাজস্থানের এক প্রাচীন কেল্লায় রাত কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে গল্প শুনেছি, সে নাকি এক আশ্চর্য অনুভূতি।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আমরা সেরকম কোনও ব্যবস্থা করতে পারি না?"

অনিকেত বলল, "কেল্লার ভিতর সাধারণত কোনও হোটেল থাকে না। আর যেসব মানুষ কেল্লায় বসবাস করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অপরিচিত মানুষজনকে নিজেদের বাড়িতে ঠাঁই দেবেন না। কাজেই ইচ্ছে হলেও আমাদের সে সুযোগ নেই।"

অনিকেতের কথা শুনে পার্থ কী যেন তাকে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের উদ্দেশে একটু দূর থেকে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?"

পার্থ তাকিয়ে দেখল, ঘরের কোনার এক টেবিল থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চুল প্রায় সব সাদা, চোখে পুরনো ধরনের গোল ফ্রেমের চশমা, পরনে ধুতির উপর চাদর জড়ানো। টেবিলের নিচ থেকে উঁকি মারছে তাঁর সাদা কেড্‌স পরা পা দু'টো। ভদ্রলোকই যে প্রশ্নকর্তা তা বুঝতে অসুবিধে হল না পার্থর। সে বলল, "হ্যাঁ, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি।"

"বেড়াতে নিশ্চয়ই?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

এবার অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, বেড়াতে," তারপর সে জিজ্ঞেস করল, "আপনিও বেড়াতে নাকি?"

ভদ্রলোক বললেন, "না, আমি এখানেই থাকি। এখানেই

আমার পাঁচ পুরুষের বাস।"

তাঁর কথা শুনে পার্থ বলল, "তা হলে আপনি বাঙালি না রাজস্থানি?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "সরকারি কাগজপত্রে আমি রাজস্থানী, কিন্তু আসলে আমি বাঙালি। আর সেই জন্যেই তো আপনাদের দেখে আমি বাংলায় কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।"

অনিকেত জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো পুরুষানুক্রমে এখানকার বাসিন্দা বললেন। এখানে তো স্থানীয় ভাষায় নিশ্চয়ই আপনাকে কথাবার্তা বলতে হয়? তা হলে আপনি এত ভাল বাংলা বলেন কীভাবে?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ পূজারি ব্রাহ্মণ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে একসময় চিতোরে এসেছিলেন। তাঁর আমল থেকে আমরা বংশানুক্রমিকভাবে কেল্লার এক মন্দিরের পূজারি হলেও বাড়িতে বাংলায় কথা বলার রেওয়াজটাও তখন থেকে চলে আসছে। আমার মা, পিতামহীরাও সকলেই ছিলেন বাঙালি। ছেলেবেলায় আমি বাবা-মা'র কাছ থেকে বাংলা শিখেছি। তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বাড়িতে বাংলাতেই কথা হত। চিতোরে বেশ কিছু বাঙালি পরিবার আছে। জজমানির সুবাদে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার। তা ছাড়া অনেক বাঙালি এখানে আপনাদের মতো বেড়াতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা হয় আমার। কাজেই ভাষাটা আমি ভুলিনি।" একটানা এত কথা বলার পর ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে অনিকেতদের জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনাদের কী করা হয়?"

খেতে-খেতে অনিকেত বলল, "এখনও তেমন কিছু করি না। কলেজের শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি। পাশ করার পর আমি চাকরি খুঁজব। আর আমার এই বন্ধুর বই ছাপাবার ব্যবসা মানে প্রকাশনা সংস্থা আছে। পৈতৃক ব্যবসা, সেই কাজেই লেগে যাবে ও।"

ভদ্রলোক এর পর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা ক'দিন থাকবেন এখানে? একদিন না দু'দিন?"

পার্থ বলল, "দু'দিন।"

ভদ্রলোক যেন খুশি হলেন তার কথা শুনে। চাদরের খুঁট দিয়ে চশমার কাচটা মুছতে-মুছতে তিনি বললেন, "ভাল ভাল! অন্তত দু'টো দিন না থাকলে কেল্লাটাকে ভালভাবে চেনা যায় না। হাজার বছরের প্রাচীন কেল্লা। এর প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথরের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে না পারলে জানার চেয়ে অজানাই থেকে যায় বেশি। অথচ সাধারণ পর্যটকরা মাত্র একবেলায়ই কেল্লা দেখে অন্য জায়গায় চলে যান।"

তাঁর কথা শুনে চায়ের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে অনিকেত বলল, "আমরা কিন্তু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব কিছু দেখব বলে ভেবেছি, আর সেজন্যেই দু'দিন থাকা এখানে।"

অনিকেতদের খাওয়া শেষ, এবার তাদের উঠতে হবে। অনিকেত টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে ভদ্রলোককে বলল, "আমরা তা হলে এবার উঠছি। এখান থেকে বেরিয়ে আমাদের আবার হোটেল ঠিক করতে হবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল।"

ভদ্রলোক বললেন,, "হ্যাঁ আসুন, ভাল করে বেড়ান। তবে টাঙায় চাপার আগে ভাল করে দরদাম করে নেবেন। বাইরের লোক দেখলে অনেক সময় ওরা বেশি দর হাঁকার চেষ্টা করে।"

অনিকেত বলল, "আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

দোকানির খাবারের দাম মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। পার্থ জিজ্ঞেল করল অনিকেতকে, "এবার কোন দিকে যাবি?"

অনিকেত বলল, "দেখি, কাউকে জিজ্ঞেস করি, হাঁটাপথে কাছাকাছি কোনও হোটেল বা ধর্মশালা আছে কি না। নইলে টাঙা ভাড়া করে খুঁজতে যাব।"

পার্থ বলল, "তা হলে এতক্ষণ যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললাম আমরা, তাঁর থেকে জেনে নিলেই তো ভাল হত। স্থানীয় মানুষ, নিশ্চয়ই এসব খবর ভাল জানেন।"

অনিকেত বলল, "তা হলে চল, ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোকের কাছ থেকে জেনে নিই।"

ওদের আর দোকানের ভিতরে ঢুকতে হল না। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন সেই বৃদ্ধ। তিনি অনিকেতদের দিকে না তাকিয়ে সামনের রাস্তা ধরতে যাচ্ছিলেন। পার্থ তাঁর উদ্দেশে বলল, "এই যে, একটু শুনবেন।"

পার্থর গলা শুনে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন তাদের দিকে। তারপর বললেন, "আমাকে কিছু বললেন?"

পার্থ বলল, "হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে মোটামুটি ধরনের হোটেল বা ধর্মশালা কোথায় আছে বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "সামনের রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে একটা জৈন ধর্মশালা পাবেন। তার কাছাকাছিই আছে 'মহেশ্বরী' নামের একটা ধর্মশালা। কেল্লার কাছেও একটা ধর্মশালা আছে। এগুলো মোটামুটি মন্দ নয়। আর হোটেলে থাকতে হলে আপনাদের বাসস্ট্যান্ডের কাছে যেতে হবে।"

অনিকেত জিজ্ঞেস করল, "বাসস্ট্যান্ড এখান থেকে কত দূর?"

বৃদ্ধ বললেন, "কিছুটা দূর আছে। টাঙায় দশ টাকা ভাড়া নেবে। তবে কেল্লার কাছে যে ধর্মশালাটা আছে, আগে সেখানে দেখতে পারেন। সেখানে থাকার জায়গা পেলে কেল্লা ঘুরে দেখতে আপনাদের সুবিধে হবে। একটা টাঙা ভাড়া করে আপনারা সেখানে চলে যান।"

অনিকেত বলল, "অনেক উপকার হল। আচ্ছা নমস্কার।"

ভদ্রলোকও প্রতিনমস্কার জানিয়ে নিজের রাস্তা ধরার জন্য পা বাড়ালেন। পার্থ অনিকেতকে বলল, "টাঙা ভাড়া করে কেল্লার কাছে যে ধর্মশালা আছে সেখানেই আগে যাওয়া যাক। কেল্লার ভিতর তো আমাদের থাকা হবে না। তবে তার কাছাকাছি থাকতে পারলে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো যাবে।"

অনিকেতদের সঙ্গে কথা বলে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ থেমে ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে এসে পার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার কথাটা যেতে-যেতে কানে গেল, তাই একটা কথা বলতে এলাম। আপনারা সত্যিই কেল্লায় রাত কাটাতে চান নাকি?"

তাঁর কথা শুনে পার্থ বলল, "সেখানে থাকার একটা ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু থাকার কোনও জায়গা আছে কি?"

ভদ্রলোক কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,

"কেল্লায় কোনও হোটেল বা ধর্মশালা নেই, তবে..." এই বলে চুপ করে গেলেন।

অনিকেত বলল, "তবে কী?"

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমার বাড়িতেই একটা ঘর খালি আছে, আপনারা ইচ্ছে করলে থাকতে পারেন। তবে সেখানে বিজলি বাতি নেই, এই যা একটু অসুবিধে।"

"আপনি ঘর ভাড়া দেন? কত ভাড়া?" অনিকেত জিজ্ঞেস করল।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, "না, আমি ঘর ভাড়া দিই না। আমি পূজারি ব্রাহ্মণ, বিয়ে-থা করিনি, একলা মানুষ। জজমানি করে যেটুকু আয় হয় তাতেই আমার চলে যায়। আপনারা বাঙালি, তাই বললাম। একলা থাকি, দু'দিন আপনাদের সঙ্গে গল্প করে কাটানো যাবে। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া কী?" প্রশ্ন করল পার্থ।

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, "আমার একটু লেখালিখির বাতিক আছে। কেল্লার ইতিহাস নিয়ে আমি একটা লেখা লিখেছি। লেখাটা আমি আপনাদের শোনাতে চাই। আপনার তো বই ছাপাবার ব্যবসা আছে। ভাল লাগলে যদি কলকাতায় গিয়ে সেটা ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। অনেক দিন ধরে সেটা ছাপাবার ইচ্ছে আমার। কিন্তু এ তল্লাটে বাংলায় বই ছাপাবার কোনও ছাপাখানা নেই।"

তাঁর কথা শুনে পার্থ কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। অনিকেত চুপ করে ভাবতে লাগল অপরিচিত এই বৃদ্ধের বাড়িতে হুট করে চলে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। অচেনা জায়গা, ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত।

বৃদ্ধ এবার বললেন, "আপনারা বরং ভাবুন, আমি এখনই আসছি," এই বলে তিনি গিয়ে ঢুকলেন সামনের একটা দোকানে।

বৃদ্ধ তাদের সামনে থেকে চলে যাওয়ার পর পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কী করবি?"

অনিকেত বলল, "প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে লোভনীয়! হাজার বছরের প্রাচীন কেল্লার মধ্যে রাত কাটানো বেশ একটা থ্রিলিং ব্যাপার। কিন্তু ভদ্রলোকের মনে কোনও দুরভিসন্ধি নেই তো! বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরে বেশি টাকাপয়সা দাবি করবেন না তো? একবার পুরী বেড়াতে গিয়ে আমি এরকম একটা লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম।"

পার্থ তার কথা শুনে বলল, "লোকটিকে তেমন মনে হচ্ছে না। একটা কাজ করা যাক, আগে ওঁর সঙ্গে যাই। গিয়ে যদি দেখি বাড়িটা পছন্দ হচ্ছে না বা লোকটির ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না, তখন ফিরে আসবখ'ন।"

"ঠিক আছে," অনিকেত রাজি হল পার্থর কথায়।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফিরে এলেন বৃদ্ধ। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কী ঠিক করলেন আপনারা?"

অনিকেত বলল, "আমরা যাব আপনার সঙ্গে। কিন্তু জায়গাটা পছন্দ না হলে ফিরে আসব।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ঠিক আছে।।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কিসে যাব আমরা?"

ভদ্রলোক বললেন, "টাঙায়। আমি বরং টাঙা নিয়ে আসি। আর আপনাদের যদি টুকিটাকি কিছু কেনার থাকে তো এখান থেকে কিনে নিন। কেল্লার ভিতর দোকানপাট খুব একটা বেশি নেই, আর দামও বেশি," এই বলে ভদ্রলোক টাঙা আনতে চলে গেলেন।

অনিকেতদের কিছু জিনিস কিনতে হবে। তারা কাছেই একটা দোকানে গেল। কয়েক প্যাকেট বিস্কুট, কেক আর দু'টো জলের বোতল নিল। দাম মেটাবার জন্য পার্থ পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিতেই দোকানদার বলল, "পাঁচশো টাকার নোট এখন এখানে কেউ নিচ্ছে না, খুব জাল হচ্ছে।"

অগত্যা খুচরো টাকায় দাম মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল তারা। আর তখনই দেখতে পেল ভদ্রলোককে টাঙা নিয়ে আসতে। তাঁকে দেখে তারা একটু অবাক হল। অনিকেতরা ভেবেছিল, ভদ্রলোক টাঙা ভাড়া করতে গিয়েছেন। কিন্তু টাঙার চালকের আসনে বসে আছেন ভদ্রলোক! অনিকেতদের সামনে টাঙা দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন, "নিন, উঠে পড়ুন।"

পার্থ বলল, "টাঙা কি আপনি চালাবেন নাকি?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, এটা আমার টাঙা, এটা নিয়েই আমি ঘুরে বেড়াই। কেল্লার বাসিন্দাদের টাঙাই এখনও প্রধান বাহন।"

অনিকেতরা আর কথা না বাড়িয়ে মালপত্র নিয়ে উঠে পড়ল টাঙায়। চলতে শুরু করল টাঙা।

॥ ২ ॥

অনিকেতদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে টাঙা। পথের দু'পাশ দেখতে-দেখতে এগিয়ে চলল তারা। টাঙাটা বেশ পুরনো। মাঝে-মাঝে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ উঠছে চাকার ধুরা থেকে। অনিকেতের মনে হল, টাঙাটা আবার ভেঙে পড়বে না তো! টাঙা চালাতে-চালাতে ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের নাম কিন্তু আমার এখনও জানা হয়নি।"

পার্থ তাঁর কথা শুনে বলল, "আমার নাম পার্থ আর ওর নাম অনিকেত। আপনার নাম?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য।"

ভদ্রলোকের নাম শুনে অনিকেত বলল, "জয়পুর শহর যিনি তৈরি করেছিলেন সেই বিদ্যাধর ভট্টাচার্য আপনার কেউ হতেন নাকি?"

বিদ্যাপতি বললেন, "না, তিনি আমার কেউ নন। আমার পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাধারণ পূজারি ব্রাহ্মণ। বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের মতো অত গুণী মানুষ তাঁদের কেউ ছিলেন না।"

পার্থ আবার জিজ্ঞেস করল, "কেল্লায় তো যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা কী হবে?"

বিদ্যাপতি বললেন, "কেল্লায় কয়েকটা খাবারের দোকান আছে। আর আপনারা যদি চান তা হলে আমিই আপনাদের দু'টো ডাল-ভাত ফুটিয়ে দিতে পারি।"

অনিকেত পার্থকে বলল, "আগে তো যাই, খাবারের ব্যাপারটা পরে ভাবা যাবে।"

যেতে-যেতে এক সময় টাঙা ফোর্ট রোডে এসে পড়ল। পাহাড়ের মাথার উপর সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা কেল্লার গবাক্ষ-বুরুজ-মিনারগুলো ক্রমশই আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে অনিকেতদের চোখে। দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর কেল্লার মধ্যে

দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্তম্ভের শীর্ষদেশ। সেটা দেখিয়ে অনিকেত পার্থকে বলল, "ওটা নিশ্চয়ই চিতোরের বিখ্যাত বিজয়স্তম্ভ!"

ফোর্ট রোড বেশ জমজমাট। পথের দু'পাশে অনেক দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি রয়েছে। রাস্তায় টাঙা আর অটোরিকশার ভিড়। টুরিস্ট সিজন, তাই রাস্তায় অনেক টুরিস্ট বাসও চোখে পড়ছে। একসময় তারা পাহাড়ের কাছে এসে হাজির হল। পাহাড়ের নীচে ঠিক তার গা বেয়ে রয়েছে বেশ চওড়া একটা শুকনো নদীখাত। তার উপর কংক্রিটের একটা ব্রিজ। ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে-যেতে পার্থ বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী নদী?"

বিদ্যাপতি বললেন, "এর নাম 'গাম্ভীরী'। একসময় এই নদী চিতোরের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করত। তখন কিন্তু পাহাড়ের নীচে কোনও জনপদ ছিল না। চিতোর বলতে পাহাড়ের মাথার উপর প্রাকারবেষ্টিত দুর্গনগরীকেই বোঝাত। এই দুর্গনগরী থেকেই রাজস্থানের তামাম মরু রাজ্যকে শাসন করতেন রানারা।"

ব্রিজ পার হওয়ার পর শুরু পাকদণ্ডী বেয়ে উপরে ওঠার পথ। সে পথ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল বিদ্যাপতির টাঙা। পথের একপাশে দুর্গপ্রাকার আর অন্যপাশে পাহাড়ের পাথুরে দেওয়াল। সেদিকে অনিকেতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদ্যাপতি বললেন, "আপনারা পথের বাঁ পাশে কালচে ধরনের যে পাথরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলে 'চিত্তৌর'। এর থেকেই 'চিতোর' শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন।"

পাকদণ্ডী বেয়ে তারা ক্রমশ উপরে উঠতে লাগল। তাদের পাশ দিয়ে আরও অনেক টাঙা যাওয়া-আসা করছে। পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার খুরের খটাখট-খটাখট শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তাদের চোখে পড়ল বিরাট এক পাথুরে তোরণ। এত বড় তোরণ যে, তার নিচ দিয়ে হাওদা সমেত হাতি অনায়াসে গলে যেতে পারে। বয়সের ভারে তোরণের অবস্থা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। মাথার উপর জন্মেছে বটগাছ। একটা বিশাল লোহার কপাট মহাকালের সাক্ষী হয়ে আজও কীভাবে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তোরণের গায়ে। বিদ্যাপতি বললেন, "আপনারা যে তোরণ দেখতে পাচ্ছেন তার নাম 'পোদল পোল'। এরকম সাত-সাতটা তোরণ পেরিয়ে আমাদের কেল্লানগরীতে ঢুকতে হবে। অন্য পোল বা তোরণগুলোর নাম, ভৈঁর পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোড়লা পোল, লক্ষ্মণ পোল ও রাম পোল বা সূর্যতোরণ। এই পোলগুলো ছিল দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। দুর্ভেদ্য ছিল এইসব তোরণ। আপনারা লক্ষ করুন, তোরণের গায়ে যে লোহার কপাটটা আজও দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথার দিকে লোহার গজাল পোঁতা আছে। শত্রুসেনারা হাতি দিয়ে গুঁতিয়ে যাতে তোরণ ভাঙতে না পারে, তার জন্য তোরণের কপাটে এই ব্যবস্থা করা থাকত। সম্রাট আকবরের সমুদ্র সমান সেনাবাহিনীকেও তিনমাস রুখে দিয়েছিল এই তোরণ।"

পার্থ বলল, "আলাউদ্দিন খলজিই তো সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিলেন চিতোরগড়, তাই না?"

টাঙা চালাতে-চালাতে বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ, আমির খসরুর 'তারিখ-ই ফিরোজশাহি' বইয়ে তার সন-তারিখ উল্লেখ আছে। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অগস্ট তিনি চিতোর অধিকার করেন।" এর পর একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "চিতোর দ্বিতীয়বার পদানত হয় ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহর কাছে। আর শেষ আক্রমণ করেন সম্রাট আকবর ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় চিতোরগড়।"

বিদ্যাপতির কথা শুনে অনিকেতরা বুঝতে পারল, কেল্লার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। বিদ্যাপতির কথা শুনতে-শুনতে পাকদণ্ডী বেয়ে ক্রমশই উপর দিকে উঠতে লাগল তারা। একসময় বিদ্যাপতি বললেন, "আপনাদের একটা কথা বলি, কেল্লায় কেউ যদি আপনাদের পরিচয় জানতে চায় তা হলে দয়া করে বলবেন যে, আপনারা আমার আত্মীয় হন। আমার কাছে বেড়াতে এসেছেন।"

তাঁর কথা শুনে অনিকেত বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু এ কথা বলতে হবে কেন?"

বিদ্যাপতি বললেন, "কেল্লায় সাধারণ টুরিস্টদের রাতে থাকার নিয়ম নেই। তার জন্য সরকারের অনুমতির দরকার হয়। অনেক ঝামেলা সেসব করতে হলে। তাই আমার আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দিতে বলছি আপনাদের।"

অনিকেত বলল, "ও!"

ভৈঁর পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল পার হয়ে আরও উপর দিকে উঠছেন তাঁরা। পথের পাশে কোনও বিশেষ কিছু দেখার থাকলে টাঙা চালাতে-চালাতে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছেন বিদ্যাপতি। দুর্গপ্রাকারের গা বরাবর উঁচু বেদির মতো সৈন্য চলাচলের যে পথ চলে গিয়েছে, তার উপর কিছু দূরে-দূরেই চোখে পড়ছে ছোট লেজওলা লালমুখো বাঁদরের দল। নীচের দিকে তাকিয়ে অনিকেতরা বুঝতে পারল, পাকদণ্ডী বেয়ে বেশ অনেকটাই উপরে উঠে এসেছে। নীচে তাদের ফেলে আসা পথের বাঁকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সামনের পথটা বেশ খাড়াই, কিছুটা সংকীর্ণও বটে। বিদ্যাপতির ঘোড়ার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এল। উলটো দিক থেকে কোনও টাঙা এলেও তাঁরা সাবধানে পাশ কাটিয়ে নীচের দিকে নামছেন। বিদ্যাপতি বললেন, "আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। আর মিনিট দশেক লাগবে সূর্যতোরণে পৌঁছতে। সূর্যতোরণ হল কেল্লানগরীতে ঢোকার প্রধান তোরণ।"

মিনিট দু'য়েকের মধ্যে একটা জায়গায় এসে পৌঁছল অনিকেতরা। পথ সেখানে ইউ-এর মতো আরও উপরে ওঠার জন্য বাঁক নিয়েছে। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বটগাছ তার ডালপালা মেলে যাত্রাপথের উপর একটা চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। বাঁকের মুখটায় আধো অন্ধকার। সেখানে ঢুকে বাঁক নিতে গিয়েই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল টাঙা। অনিকেত আর পার্থ উপর থেকে তাকিয়ে পাহাড়ের নীচের দৃশ্য দেখছিল। ঝাঁকুনি খেয়ে নিজেদের কোনওরকমে সামলে নিয়ে তারা সামনের দিকে তাকাল। তারা দেখল, পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আড়াআড়িভাবে রাস্তা আগলে এসে দাঁড়িয়েছে এক ঘোড়সওয়ার। গায়ে তার রাজাদের মতো ঝলমলে পোশাক। কোমরে চামড়ার খাপে লম্বা তলোয়ার, পায়ে জমকালো নাগরা। শুধু মাথায় পাগড়ির বদলে একটা ক্রিকেট ক্যাপ। বেশ সুন্দর, লম্বা, ফরসা চেহারা। বয়স মনে হয় অনিকেতের চেয়ে কিছু বেশি, অর্থাৎ আঠাশ-তিরিশ হবে। পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরও দু'জন ঘোড়সওয়ার।

তাদের পোশাক অবশ্য জলুসহীন। পরনে খাটো ধুতির উপর ফতুয়া ধরনের জামা পরা, মাথায় রাজস্থানী পাগড়ি। দু'জনেরই হাতে ধরা আছে বর্শা। দেখে মনে হল, প্রথমজনের অনুচর তারা দু'জন। ঝলমলে পোশাক গায়ে লোকটি বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিদ্যাপতির টাঙার দিকে। তারপর বিদ্যাপতিকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনার টাঙায় কারা?"

বিদ্যাপতি হিন্দিতে বললেন, "এঁরা আমার আত্মীয়, কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন।"

তাঁর কথা শুনে লোকটি একবার ভাল করে তাকিয়ে নিল অনিকেত আর পার্থর মুখের দিকে। তারপর বিদ্যাপতিকে বলল, "তা কী ঠিক করলেন পণ্ডিতজি?"

বিদ্যাপতি বললেন, "এখনও ভাবিনি কিছু।"

লোকটি বলল, "ভাবুন, তাড়াতাড়ি ভাবুন," এর পর আর কোনও কথা বলল না লোকটি। তার কালো রঙের পাহাড়ের মতো ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে অনিকেতদের টাঙার পাশ দিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। তার সঙ্গী দু'জনও তাকে অনুসরণ করল। তারা চলে যাওয়ার পর আবার টাঙা চলতে শুরু করল। লোকটির পোশাক দেখে পার্থর মনে তার সম্বন্ধে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হল। বিদ্যাপতিকে সে বলল, "কিছু মনে করবেন না, রাজার মতো পোশাক পরা লোকটি কে?"

বিদ্যাপতি বললেন, "ওঁর নাম রানা বিক্রম সিংহ, রাজবংশধর।"

"রাজবংশধর! তাঁরা এখনও কেল্লায় থাকেন নাকি?" প্রশ্নটা করল অনিকেত।

বিদ্যাপতি বললেন, "সকলে না থাকলেও কেউ-কেউ থাকেন এখনও। তাঁদের নিজস্ব মহল আছে কেল্লায়। তবে রাজবংশধরেরা অধিকাংশই থাকেন উদয়পুর বা জয়পুরে। অনেকে বিদেশেও থাকেন।"

লক্ষ্মণ পোল অতিক্রম করে কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিকেতরা হাজির হল সূর্যতোরণের সামনে। বয়সের ভারে কিছুটা ধ্বংস হলেও তোরণের গায়ে অপূর্ব শিল্পকলার চিহ্ন আজও আছে। বিশাল সূর্যতোরণের ভিতর ঢুকতে-ঢুকতে বিদ্যাপতি বললেন, "এই তোরণের মাটি রাজপুতদের কাছে খুবই পবিত্র। সূর্যতোরণ ছিল দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শেষ স্তর। মাতৃভূমি রক্ষার্থে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে-করতে অনেক রাজপুত বীর শহিদ হয়েছেন এখানে। ইতিহাসে তাঁদের অনেকের নাম লেখা আছে। শত্রুর হাতে সূর্যতোরণের পতন ঘটলেই পতন ঘটত চিতোরগড়ের। কেল্লায় শুরু হত বহ্নি উৎসব। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করতেন ঝাঁকে-ঝাঁকে রাজপুত নারী।"

সূর্যতোরণ অতিক্রম করার পর পথের দু'পাশে মাটি থেকে একটু উঁচু বেদির মতো করা আছে। সেগুলো দেখিয়ে অনিকেত জিজ্ঞেস করল, "ওর উপর কি সৈন্যরা দাঁড়িয়ে তোরণ পাহারা দিত?"

বিদ্যাপতি বললেন, "না, তারা থাকত তোরণের মাথার উপরের অলিন্দে আর তার পাশের দুর্গপ্রাকারে। এই বেদিগুলো ব্যবহৃত হত অন্য কাজে। মহারানা হাম্বীর, মহারানা কুম্ভ, মহারানা সংগ্রাম সিংহ প্রমুখ রাজপুত বীররা যখন যুদ্ধ জয় করে কেল্লায় ফিরে আসতেন, তখন ওই বেদির উপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশে শঙ্খধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টি করতেন রাজপুত

রমণীরা।"

সূর্যতোরণ বা রাম পোল পার হয়ে অনিকেতরা ঢুকল কেল্লার ভিতর। সামনেই একটা প্রশস্ত চত্বর। তার একপাশে অনেক টাঙা আর অটোরিকশা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু ছোটখাটো দোকানপাটও রয়েছে সেখানে। গাইড আর টাঙাচালকদের হাঁকডাকে জায়গাটা বেশ জমজমাট। সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল বিদ্যাপতির টাঙা। কিছুটা পথ চলার পর পথের ডান পাশে একটা মাঠের মধ্যে খুব জীর্ণ প্রাসাদ চোখে পড়ল। প্রাসাদ না বলে তাকে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ বলাই মনে হয় ভাল। তার সামনে পর্যটকদের ভিড়। বিদ্যাপতি বললেন, "ওই হল কুম্ভ প্রাসাদ, কেল্লার সবচেয়ে প্রাচীন প্রাসাদ। চিতোরের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই প্রাসাদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। আপনারা আগে আমার বাড়িতে চলুন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আপনাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব।"

কুম্ভ প্রাসাদকে পিছনে ফেলে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল টাঙা। বিদ্যাপতি বললেন, "এবার আমরা কেল্লার প্রধান সড়ক ছেড়ে আমার বাড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরলাম।"

এ পথটা অপেক্ষাকৃত সরু। একটু এগোবার পর পথের দু'পাশে চোখে পড়তে লাগল ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা পুরনো ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। পথের দু'পাশে বড়-বড় গাছও আছে। টাঙার শব্দে হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা প্রাচীরের উপর উঠে বসল বিরাট একটা ময়ূর। তার গলার নীল রং সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। রাজস্থান আসার পর এই প্রথম ময়ূর দেখতে পেল অনিকেতরা। উট, ময়ূর আর কেল্লা, এই তিন নিয়েই তো রাজস্থান! উট অবশ্য এর আগে অনেক দেখতে পেয়েছে তারা। ময়ূরটা একটা কর্কশ ডাক ছেড়ে লাফিয়ে অনিকেতদের সামনে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা প্রাচীরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও কিছুটা এগোবার পর টাঙা চলে এল দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি। তারপর মিনিট পাঁচেক চলার পর টাঙার গতি একসময় মন্থর হয়ে এল। রাস্তা থেকে নেমে বিদ্যাপতির টাঙা এসে থামল একটা পুরনো একতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটা পুরনো হলেও বাইরেটায় সাদা চুনকাম করা। বাড়ির সামনেটাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। টাঙা থেকে নেমে বিদ্যাপতি অনিকেতদের বললেন, "এই আমার বাসা। ভিতরে ঢুকে দেখুন বাড়িটা পছন্দ হয় কিনা! বাড়িটা পুরনো হলেও কেল্লার যা বয়স তার তুলনায় বাড়িটাকে শিশুই বলা যেতে পারে। আমার ঠাকুরদা তৈরি করেছিলেন এ বাড়ি। বয়স খুব বেশি হলে একশো বছরের কিছু বেশি হবে।"

টাঙা থেকে মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল অনিকেত আর পার্থ। বিদ্যাপতি কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে সদর দরজার তালা খুলতে লাগলেন।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতির বাড়িটা মোটামুটি পছন্দ হয়ে গেল অনিকেত এবং পার্থর। আকাশ খোলা একফালি বারান্দা ঘিরে গোটা আষ্টেক বড়-বড় ঘর। তবে ঘরগুলোর অধিকাংশই মনে হয় দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। পুরু ধুলো জমেছে ঘরগুলোর চৌকাঠের বাইরে। বন্ধ জানলার গরাদে জাল বুনেছে মাকড়সা। তবে বারান্দার যেদিকে অনিকেতদের ঘর, সেদিকটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনিকেতদের ঘরের মেঝেও বেশ ঝকঝকে-তকতকে, যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা। ঘরের মাঝখানে রয়েছে আগেকার দিনের বিরাট এক পালঙ্ক। তার উপরের বালিশ-বিছানাও মন্দ নয়। ঘরের কোনায় একটা চেয়ার-টেবিলও আছে। আর কী চাই অনিকেতদের! স্নান সেরে পোশাক পালটে কেক-বিস্কুট দিয়ে টিফিন সেরে বিছানায় শুয়ে তারা অপেক্ষা করছিল বিদ্যাপতির জন্য। বিদ্যাপতি অনিকেতদের ঘরের পাশে নিজের ঘরে গিয়েছেন। তিনি তৈরি হয়ে অনিকেতদের নিয়ে কেল্লা দেখতে যাবেন। খাটের উপর শুয়ে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল অনিকেত। কলকাতা থেকে বইটা সঙ্গে করে এনেছে সে। কর্নেল টডের লেখা বিখ্যাত বই 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ় অফ রাজস্থান'-এর একটা বাংলা অনুবাদ। ট্রেনে আসবার পথে বইটার প্রায় সবটাই পড়ে ফেলেছে। অল্প কিছুটা বাকি আছে। পার্থ তাকিয়েছিল খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। জানলার বাইরে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি, তারপর বড়-বড় গাছের জঙ্গল। অনেক দূরে জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে চোখে পড়ছে এক জীর্ণ প্রাসাদের চূড়া। সম্ভবত জঙ্গলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাসাদটা। পার্থ সেদিকে তাকিয়ে অনিকেতকে বলল, "তা হলে এ বাড়িতে থাকা আমাদের একেবারে ফাইনাল তো?"

অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, ফাইনাল।"

কয়েক মিনিট পর বিদ্যাপতি পোশাক পালটে এসে দাঁড়ালেন অনিকেতদের ঘরের চৌকাঠে। তাঁর পরনে এখন পুরোদস্তুর রাজস্থানি পোশাক। মাথায় পাগড়ি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। এমনিতেই বিদ্যাপতি বেশ লম্বা মানুষ, পাগড়ির জন্য এখন আরও লম্বা দেখাচ্ছে তাঁকে। অনিকেতদের তিনি বললেন, "আমি তৈরি, চলুন এবার কেল্লা দেখতে বেরিয়ে পড়ি।"

পার্থ ক্যামেরা আর অনিকেত জলের বোতল হাতে বাইরে এসে দাঁড়াল। দরজার পাল্লাটা বন্ধ করতে-করতে পার্থ বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাছে একটা তালা হবে? আমাদের কাছে যে তালাটা ছিল সেটা আমি ভুল করে জয়পুরের হোটেলে ফেলে এসেছি।"

বিদ্যাপতি বললেন, "না, সদর দরজার তালা ছাড়া অন্য তালা আমার কাছে নেই। দরজার শিকলটা শুধু তুলে দিন, তা হলেই হবে। এখানে চোর নেই।"

ক্যামেরা, টাকাপয়সা সবই অনিকেতদের সঙ্গে রয়েছে। ঘরে দামি জিনিস কিছু নেই, শুধু তাদের জামাকাপড় রয়েছে। তাই বিদ্যাপতির কথা শুনে দুশ্চিন্তা না করে পার্থ শুধু শিকলটা তুলে দিল। তারপর বিদ্যাপতির পিছন-পিছন তারা পা বাড়াতে যেতেই তাদের কানে এল এক কণ্ঠস্বর, "কে, বিদ্যা নাকি?"

সেই কণ্ঠস্বর কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিদ্যাপতি। তারপর বারান্দার উলটো দিকের একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমি।"

সে ঘরটা বাইরে থেকে শিকল তুলে বন্ধ করা, কিন্তু অনিকেতরা দেখল, সেই বন্ধ ঘরের জানলাটা ভিতর থেকে আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছে! পাল্লাটা বেশ কিছুটা খুলে যাওয়ার পর

অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে উঁকি মারলেন একজন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের অনেক বয়স, মাথার সব চুল একদম সাদা, বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে সাদা দাড়ি, খালি গা। তাঁর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে ধরনের। অনিকেতদের দিকে তিনি একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বিদ্যাপতিকে বললেন, "ওরা কারা? ওরা কি কুম্ভের গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে?"

বৃদ্ধ মনে হয় কানে কম শোনেন। তাই বিদ্যাপতি গলাটা একটু চড়িয়ে বললেন, "ওঁরা বাঙালি, কলকাতা থেকে কেল্লা দেখতে এসেছেন।"

"কেল্লা দেখতে কলকাতা থেকে... কলকাতা... কলকাতা... সে তো অনেক দূর। আমি একবার কলকাতা গিয়েছি।"

জানলার পাল্লাটা ধীরে-ধীরে আবার বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরও হারিয়ে গেল ঘরের ভিতর। পার্থ অবাক হয়ে বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "উনি কে?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিদ্যাপতি বললেন, "উনি আমার দাদা গণপতি।"

অনিকেত বলল, "তা হলে আপনি যে বলেছিলেন আপনি একলা মানুষ?"

বিদ্যাপতি বললেন, "একলাই বলা যায়। কারণ, আপনারা যাঁকে দেখলেন, তিনি থেকেও নেই। দাদা কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। খাওয়াদাওয়াও এখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। চিতোরেশ্বরীর দয়ায় এখনও বেঁচে আছেন," বিদ্যাপতি বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বিদ্যাপতির টাঙা চেপে অনিকেত-পার্থ বেরিয়ে পড়ল কেল্লা দেখতে।

বিদ্যাপতির টাঙা প্রথমে এসে থামল কুম্ভ প্রাসাদের সামনে। অনিকেতদের নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ধ্বংসস্তূপের ভিতর ঢুকতে-ঢুকতে তিনি বললেন, "এই প্রাসাদ সম্ভবত মহারানা সমর সিংহের আমলের। আলাউদ্দিনের আক্রমণে একবার ধ্বংস হয় এই প্রাসাদ। মহারানা হাম্বীর ও তাঁর পরে মহারানা কুম্ভ প্রাসাদের সংস্কার করেন। মহারানা কুম্ভের সময় থেকে এই প্রাসাদ পরিচিত হয় কুম্ভপ্রাসাদ নামে।"

অনিকেতরা এসে দাঁড়াল প্রাসাদের ভিতরে। চারপাশে শুধু ইট-পাথরের স্তূপ। একতলার কয়েকটা ঘর আর তার মাথার উপরে কিছু ছাদহীন দেওয়াল শুধু দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সাক্ষী হয়ে। বিদ্যাপতি বললেন, "একসময় এই প্রাসাদ বিভক্ত ছিল, দরবার মহল, মন্দির মহল, জেনানা মহল, সুরজ মহল, কানওয়ারপদ মহল ইত্যাদিতে। প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ধ্বংসস্তূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানেই একসময় ছিল কানওয়ারপদ মহল। ওখানেই বাস করতেন মীরাবাঈ। ওই মহলেরই একটি ঘরে কৃষ্ণনাম স্মরণ করে তিনি বিষের পাত্র তুলে নিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্যের হাত থেকে। কিন্তু সেই বিষ পরিণত হয়েছিল অমৃতে। কানওয়ারপদ মহলেরই একটি ঘরে মেবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু উদয় সিংহকে ঘাতক বনবীরের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজের শিশুপুত্রকে বলি দেন ধাত্রী পান্না। এরকম নানা ইতিহাস ছড়িয়ে আছে এ প্রাসাদের আনাচেকানাচে।"

অনিকেতরা বিদ্যাপতির সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ। বিদ্যাপতি বলে যেতে লাগলেন প্রাসাদের ইতিহাস। তাঁর কথা তন্ময় হয়ে দু'জনে শুনতে লাগল। অনিকেতের মনে হল, এই জীর্ণ প্রাসাদ, তার ইতিহাস যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। এক সময় বিদ্যাপতি অনিকেতদের এনে দাঁড় করালেন এক জায়গায়। মাটির গভীরে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে সেখান থেকে। বিদ্যাপতি সেই সিঁড়িগুলো দেখিয়ে বললেন, "এটা হল একটা সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখ। এখান থেকে কিছু দূরে গোমুখকুণ্ড নামে এক জলাশয় আছে। এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সেই জলাশয়ে স্নান করতে যেতেন রানিরা। এরকম অনেক সুড়ঙ্গ, ঘর ছড়িয়ে আছে কেল্লার মাটির নীচে। কুম্ভ প্রাসাদেরই মাটির নীচের একটি ঘরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন মহারানি পদ্মিনী।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "এখান দিয়ে আমরা এখন নীচে নেমে সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারব?"

বিদ্যাপতি বললেন, "না। নীচে নামার পর সুড়ঙ্গের মুখ লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ করা আছে।"

অনিকেত জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

বিদ্যাপতি বললেন, "অনেক দিনের প্রাচীন সুড়ঙ্গ, তার ভিতর ঢুকে কেউ যাতে দুর্ঘটনায় না পড়ে তাই লোহার গরাদ বসিয়েছে সরকার। আমাদের ছেলেবেলায় এসব সুড়ঙ্গের মুখ খোলা থাকতে দেখেছি। তখন বন্ধুদের সঙ্গে অনেক সময় সুড়ঙ্গের ভিতরেও ঢুকেছি।"

অনেকটা সময় ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রাসাদ দেখার পর অনিকেতরা আবার চেপে বসল টাঙায়। টাঙায় ওঠার পর পার্থ বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "এর পর আমরা কী কী দেখব?"

বিদ্যাপতি বললেন, "দেখা তো সবে শুরু হল। আমরা এখন যাব মহারানা কুম্ভের তৈরি বিখ্যাত বিজয়স্তম্ভ আর কুম্ভশ্যাম মন্দির দেখতে। তারপর যাব গোমুখকুণ্ডে। তারপর বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে দেখতে যাব চিতোরেশ্বরীর মন্দির আর পদ্মিনী প্রাসাদ।"

অনিকেত বলল, "চিতোরের অনেক কিছুই তো দেখছি কুম্ভময়!"

টাঙা চালাতে-চালাতে বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ, চিতোরের অনেক স্থাপত্যই তাঁর সময়ে তৈরি । গোটা রাজপুতনায় তাঁর অজস্র কীর্তি ছড়িয়ে আছে। এই মরুপ্রদেশে যে দুর্গগুলো ছড়িয়ে আছে, তাঁর মতে ৩৪টি দুর্গ কুম্ভ একাই তৈরি করেন। তিনি শুধু সফল রণনায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক। তিনি ছিলেন বীণাবাদক। গীতগোবিন্দর এক অপূর্ব পরিশিষ্টও রচনা করেন তিনি।"

বিদ্যাপতির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তাঁরা হাজির হলেন বিখ্যাত বিজয়স্তম্ভের সামনে। টাঙা থেকে নেমে অনিকেত আর পার্থ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মহারানা কুম্ভের সেই অমর কীর্তির দিকে। বিজয়স্তম্ভ! রাজপুতদের বীরত্ব-সংগ্রাম, দেশপ্রেমের প্রতীক! সেই রাজা, সেই রাজত্ব আর নেই। কিন্তু আজও স্বদম্ভে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে মনে করাচ্ছে রাজপুত জাতির ফেলে আসা ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে। কত বইয়ের পাতায় অনিকেত ফোটো দেখেছে এই স্তম্ভের! অবন ঠাকুরের রাজকাহিনিতে পড়েছে তার গল্প! আর আজ সে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে! এ কথা ভাবতেই কেমন একটা রোমাঞ্চ লাগছিল তার। অনিকেত এগিয়ে চলল

সেই স্তম্ভের দিকে।

বিজয়স্তম্ভ দেখে কুম্ভশ্যাম মন্দির হয়ে অনিকেতরা যখন গোমুখকুণ্ডে হাজির হল তখন ঘড়িতে একটা বাজে। রোদের তাপ থাকলেও গোমুখকুণ্ডের পরিবেশ বেশ ঠান্ডা। ধাপে-ধাপে সোপানশ্রেণি নেমে গিয়েছে গোমুখকুণ্ডর কাকচক্ষু শীতল জলে। বিদ্যাপতি বললেন, "এই কুণ্ড প্রকৃতির বিস্ময়! এমনিতেই রাজস্থান শুষ্ক দেশ, জলের পরিমাণ কম, তার উপর পাহাড়ের এত উপরে এমন মিষ্টি জলের কুণ্ড সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। দেখুন, আপনাদের বাঁ দিকে পাহাড়ের যে ফাটল থেকে জল বের হচ্ছে, সে জায়গাটা গোমুখের মতো দেখতে! তাই এর নাম গোমুখকুণ্ড।"

পার্থ বলল, "এই কুণ্ডেই রানিরা স্নান করতে আসতেন না?"

বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ। মহারানি পদ্মিনী জহরব্রত পালনের আগে এই কুণ্ডেই স্নান সেরেছিলেন। রাজপুতদের কাছে এর জল গঙ্গার জলের মতোই পবিত্র। গোমুখকুণ্ডের জল দুর্গের পানীয়জলের সমস্যা মেটাত। যুদ্ধের সময় বা অন্য কোনও সময় যাতে শত্রুরা এই জলে বিষ মেশাতে না পারে, তাই কুণ্ডের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকত।"

অনিকেতরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উলটো দিকে একটা বিরাট পাথরের ঝুলন্ত চাতাল রয়েছে। কুণ্ডের বেশ কিছুটা অংশের উপর সেই ঝুলন্ত পাথরের চাঁই একটা আচ্ছাদন তৈরি করেছে। তার নীচে কয়েকটা ছোট পাথরের ঘর চোখে পড়ল অনিকেতের। সে বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো কিসের ঘর?"

বিদ্যাপতি বললেন, "ওগুলো আসলে ঘর নয়, সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখ। ওই পথেই কুম্ভ প্রাসাদ থেকে এখানে যাওয়া-আসা করতেন রাজা-রানিরা।"

অনিকেতরা গোমুখকুণ্ডের সোপানশ্রেণিতে বসে রইল কিছুক্ষণ। কুণ্ডের শীতল পরিবেশে বসে থাকতে বেশ ভাল লাগছিল তাদের।

এক সময় বিদ্যাপতি বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেল, এবার আমাদের ফিরতে হবে। ভাল লাগলে কাল না হয় আপনাদের আবার নিয়ে আসব।"

তাঁর কথা শুনে ধীরে-ধীরে উঠে পড়ল দু'জন।

বিদ্যাপতির টাঙায় ওঠার পর ওদের দু'জনের এতক্ষণে মনে হল, তাদের বেশ খিদে পেয়েছে। পার্থ বিদ্যাপতিকে বলল, "এখানে কোনও হোটেল আছে? আমাদের খাওয়াটা সেরে নিতে হবে।"

বিদ্যাপতি বললেন, "এদিকে তেমন কোনও হোটেল নেই। তবে যাওয়ার পথে একটা দোকান পড়বে, সেখানে পুরি-সব্‌জি পাওয়া যায়। টাঙাওলারা সেখানে খাওয়াদাওয়া সারে। সেখানে আপনাদের চলবে কি?"

পার্থ বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবেলাটা ওতেই আমাদের চলে যাবে। ওবেলা সম্ভব হলে ভাতটাতের খোঁজ করা যাবে।"

বিদ্যাপতি তার কথা শুনে বললেন, "ওবেলাটা আপনারা আমার ওখানেই খাবেন। আমি ব্যবস্থা করব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাপতির টাঙা এসে থামল দোকানের সামনে। ছোট্ট দোকান, তার সামনে খাটিয়া পাতা। জনা তিনেক টাঙাওলা বসে খাচ্ছে সেখানে। অনিকেতরা গিয়ে বসল খাটিয়ার উপর। বিদ্যাপতিকেও ডাকল তাদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তিনি অনিকেতের পাশের খাটিয়ায় বসে থাকা সম্ভবত তাঁর পরিচিত একজন লোকের সঙ্গে বাজারদর নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। সব্‌জি আর গরম-গরম রুটি খেতে মন্দ লাগল না তাদের। রান্নার গুণেই হোক বা খিদের জন্যেই হোক, বেশ তৃপ্তি করে খেল তারা। তারপর আবার চেপে বসল টাঙায়। বিদ্যাপতির বাড়ির সামনে যখন পৌঁছল তখন দু'টো বেজে গিয়েছে। টাঙা থেকে নেমে দরজার তালা খুলতে-খুলতে বিদ্যাপতি বললেন, "ঘণ্টা দু'-এক বিশ্রাম নিয়ে নিন। সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা আবার বাইরে যাব।"

তালাটা খোলার পর বিদ্যাপতির পিছন-পিছন ওরা বাড়ির ভিতর ঢুকল। বিদ্যাপতি নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। পার্থও নিজেদের ঘরের শিকল খুলে ভিতরে ঢুকল। বারান্দার এক কোনায় একটা জলভরা চৌবাচ্চা আছে। সেখানে একটা ছোট বালতিও রাখা আছে। অনিকেত চৌবাচ্চা থেকে বালতিতে জল তুলে নিয়ে ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকল। সে দেখল, পার্থ ততক্ষণে টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

অনিকেত ঘরে ঢুকতেই সে বলল, "দরজাটা ভেজিয়ে দে, আলো আসছে চোখে। আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নেব।"

অনিকেত "দিচ্ছি" বলে পিছন ফিরে পাল্লাটা বন্ধ করতে যেতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল বারান্দার উলটো দিকের সেই ঘরটায়। জানলার পাল্লাটা খোলা, আর সেই জানলা দিয়ে অনিকেতের দিকে তাকিয়ে আছেন বিদ্যাপতির দাদা। অনিকেত দরজার পাল্লা ধরে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত পর জানলাটা আবার ধীরে-ধীরে বন্ধ করে দিলেন গণপতি। অনিকেতও নিজেদের ঘরের দরজার পাল্লাটা বন্ধ করে পার্থর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আগের রাতে জয়পুর থেকে আসার সময় ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি তার। বিছানায় শোওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুম নেমে এল অনিকেতের চোখে।

॥ ৪ ॥

বিদ্যাপতির ডাকে যখন অনিকেত-পার্থর ঘুম ভাঙল, তখন চারটে বেজে গিয়েছে। বিদ্যাপতি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। শীতের বেলা, আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। তার আগেই চিতোরেশ্বরীর মন্দির আর পদ্মিনী প্রাসাদ দেখা শেষ করতে হবে। আর সঙ্গে শীতের পোশাক নেবেন। সন্ধে নামার সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু ঠান্ডা পড়বে।"

মিনিট পনেরোর মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল দু'জনে। বিদ্যাপতি তৈরিই ছিলেন। অনিকেতদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন চিতোরেশ্বরী মন্দিরের দিকে। পথে যেতে-যেতে বিদ্যাপতি অনিকেতদের বললেন, "ভাবছি, চিতোরেশ্বরী মন্দিরের কাছে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি রাম পোলের কাছে বাজার করতে যাব। চিতোরেশ্বরী মন্দির থেকে পদ্মিনী প্রাসাদ বা জলমহল খুব বেশি দূরে নয়। আপনারা পায়ে হেঁটেই যেতে পারবেন সেখানে।

আমি আপনাদের জন্য বাজার করে ফিরে এসে জলমহলের কাছ থেকে আপনাদের আবার টাঙায় তুলে নেব।"

পার্থ বলল, "ঠিক আছে, তাতে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

বিদ্যাপতির বাড়ি থেকে চিতোরেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছতে তাদের মিনিট কুড়ি সময় লাগল। মন্দিরের সামনে অনিকেতদের নামিয়ে দিয়ে বাজার করতে চলে গেলেন বিদ্যাপতি। তার আগে অবশ্য টাঙা থেকে নেমেই তাঁর হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিল পার্থ। অনিকেত আর পার্থ ঢুকল মন্দির চত্বরে। প্রাচীন মন্দির, গর্ভগৃহে অধিষ্ঠান করছেন দেবী কালিকা। কালীমূর্তিই এখানে চিতোরেশ্বরীরূপে পূজিতা। গর্ভগৃহে চিতোরেশ্বরীকে দেখার পর মন্দির চত্বরে একটা বেদির উপর বসল দু'জনে। অনিকেত পার্থকে বলল, "এই চিতোরেশ্বরীকে নিয়ে একটা অদ্ভুত গল্প আছে। আমি টডসাহেবের লেখায় পড়েছি।"

পার্থ বলল, "কী গল্প?"

অনিকেত শুরু করল, "চিতোরে তখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে আলাউদ্দিনের সেনাদল ও মহারানা লক্ষ্মণ সিংহের সেনাদলের মধ্যে। প্রতিদিন বৃদ্ধ মহারানা লক্ষ্মণ সিংহ এই মন্দিরে এসে যুদ্ধজয়ের জন্য প্রার্থনা করেন কিন্তু প্রতিদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় ঘটতে থাকে রাজপুতদের। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দেন তাঁরা। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী অধরাই থেকে যান তাঁদের কাছে। একদিন রেগে গিয়ে রানা দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মা, আর কত রাজপুতদের রক্ত পান করলে তোর তৃষ্ণা মিটবে বল?' এই বলে তিনি দেবীকে 'পিশাচিনী' বলে গর্ভগৃহ ত্যাগ করলেন। সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মহারানার। তিনি শুনতে পেলেন এক কণ্ঠস্বর, 'ম্যায় ভুখা' অর্থাৎ আমি ক্ষুধার্ত। লক্ষ্মণ সিংহ দেখলেন, তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছেন চিতোরেশ্বরী। দেবী তাঁকে বললেন, 'যতদিন না যুদ্ধক্ষেত্রে তোর বারোজন পুত্রের মৃত্যু হবে ততদিন আমার রক্ততৃষ্ণা মিটবে না। রাজা বলে অভিষেক করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠা তাদের। তাদের মৃত্যু ঘটলে অবসান হবে এ যুদ্ধের।' এই বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন দেবী। পরদিন দরবারে সভাসদ্দের লক্ষ্মণ সিংহ একথা বলায় তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটা। তাঁরা ভাবলেন বৃদ্ধ মহারানা নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু সেদিন রাতেও একই স্বপ্ন দেখলেন মহারানা। পরদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দেবী আজ্ঞা পালন করবেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অরি সিংহকে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়ে তারপর তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন তিনি এবং সেখানেই তার মৃত্যু হল। দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন লক্ষ্মণ সিংহ। তাকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন না। চিতোরের ভাবী রক্ষাকর্তা বলে তাকে নির্বাচন করে তার পরিবর্তে তৃতীয় পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন। এইভাবে একের পর-এক পুত্রের প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগলেন বৃদ্ধ মহারানা," এ পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল অনিকেত।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "তারপর কী হল?"

অনিকেত বলল, "না। সে যুদ্ধে জয়লাভ করেননি লক্ষ্মণ সিংহ। মহারানার দশম পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল রাজপুতদের। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অগস্ট কেল্লার পতন হল। রক্তে পিচ্ছিল সূর্যতোরণ অতিক্রম করে কেল্লায় ঢুকলেন আলাউদ্দিন।"

অনিকেত তার কথা শেষ করার পর পার্থ বলল, "তুই তো ভাল গল্প বলতে পারিস। বিদ্যাপতিবাবুর চেয়ে কোনও অংশে কম যাস না।"

অনিকেত কব্জি উলটে একবার ঘড়ি দেখল, তারপর বলল, "চল, তা হলে এবার পদ্মিনী প্রাসাদের দিকে যাওয়া যাক।"

মন্দির চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এল অনিকেতরা। একজন স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে পদ্মিনী প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তাটা জেনে নিল তারা। তারপর সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল।

মোরাম বিছানো রাস্তা একদম সোজা চলে গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বড়-বড় গাছ আর ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। কিছুটা এগোবার পর রাস্তার বাঁ পাশে চোখে পড়ল একটা বিরাট মাঠ। সেই মাঠে একজন লোক একটা মোটরবাইক নিয়ে চক্কর কাটছে। লোকটির হাত মনে হয় কাঁচা। মাঝে-মাঝেই প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দ করছে গাড়িটা। তা দেখে পার্থ বলল, "সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবী কত পালটে যায়! হয়তো এই মাঠে একসময় ঘোড়ায় চড়া শিখত লোকে, আর আজ শিখছে মোটরবাইক। হয়তো আর একশো বছর পর এই মাঠ থেকে স্পেপশিপ উড়ে যাবে মহাকাশে।"

অনিকেত পার্থর কথা শুনে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখতে পেল, বাইকটা প্রচণ্ড শব্দ করতে-করতে ঝড়ের বেগে মাঠ ছেড়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। তা দেখে অনিকেত পার্থর হাত ধরে টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের কয়েক হাত দূর দিয়ে বাইকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটো দিকের একটা গাছে ধাক্কা মারল। চালক আর বাইক দু'পাশে ছিটকে পড়ল। ঘটনাটা দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু তারপরেই দু'জনে ছুটল লোকটা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে। তারা যখন লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন লোকটি মাটির উপর উঠে বসেছে। পার্থ বুঝতে পারল আঘাতটা তা হলে সেরকম মারাত্মক নয়। মাথায় হেলমেট থাকায় বেঁচে গিয়েছে লোকটি। সে ইশারায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে বলল। দু'জনে মিলে দাঁড় করিয়ে দিল লোকটিকে। লোকটির পরনে ব্লু জিনস আর লাল রঙের টি-শার্ট, পায়ে স্পোর্টস শু। লোকটি তার মাথার হেলমেটটি খোলার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। হাত উপরে ওঠাতে কষ্ট হচ্ছে। ডান হাতের কনুইয়ের কাছে বেশ অনেকটা ছড়ে গিয়েছে, রক্ত বের হচ্ছে সেখান থেকে। অনিকেত তার হেলমেটটা খুলে দিতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল বছর তিরিশের এক যুবকের সুন্দর মুখ। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর সে হিন্দিতে বলল, "ধন্যবাদ, আসলে নতুন কিনেছি গাড়িটা, তাই কন্ট্রোলে রাখতে পারিনি।" তারপরই সে অনিকেতদের জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি টুরিস্ট?"

পার্থ উত্তর দিতে যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ', কিন্তু বিদ্যাপতির সেই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সে বলল, "আমরা এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছি।"

তার কথা শোনার পর সে কয়েক মুহূর্ত পার্থর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "আজ সকালে পণ্ডিতজির টাঙায় তো আপনারাই ছিলেন?"

পার্থ কিছুটা অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

অনিকেতের মনে হল, লোকটিকে আগে কোথায় দেখেছে-

দেখেছে। হঠাৎ সে চিনে ফেলল লোকটিকে। এই লোকটাই তো রাজার মতো পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে অনিকেতদের টাঙার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল কেল্লায় আসার পথে! বিদ্যাপতির কথা অনুযায়ী সে একজন রাজবংশধর। অনিকেতের সঙ্গে একটা জলের বোতল ছিল। সেটা দেখে লোকটি বলল, "আমাকে একটু জল দিন।"

বোতলের মুখটা খুলে অনিকেত জলের বোতলটা এগিয়ে দিল। পার্থর এবার নজর পড়ল গাড়িটার উপর। সে কাছে গিয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। নামী কোম্পানির হালফ্যাশনের দামি বাইক, এখনও নম্বর হয়নি। গাড়ির হেডলাইটটা ভেঙে গিয়েছে। তা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষতি হয়নি। পার্থ ফিরে এল। লোকটি চোখে-মুখে বেশ ভাল করে জল দিয়ে এবং খানিকটা জল খেয়ে অনিকেতকে বলল, "ঘোড়ার পিঠ থেকে পোলো খেলার মাঠে বেশ কয়েকবার পড়েছি, তবে বাইক থেকে এই প্রথম পড়লাম। অবশ্য দিন পাঁচেক আগে জয়পুর থেকে বাইকটা আনিয়েছি।"

অনিকেত বলল, "এটা কোনও ব্যাপার নয়। প্রথম-প্রথম এরকম দুর্ঘটনা অনেকেরই ঘটে।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আপনি পোলো খেলেন?"

সে বলল, "শুধু খেলি নয়, আমি একটা নামী দলের ক্যাপ্টেন।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় খেলেন?"

"উদয়পুরে একটা প্লে-গ্রাউন্ড আছে, সেখানে," এর পর লোকটি পার্থকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা পণ্ডিতজি আপনাদের কেমন আত্মীয় হন?"

বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলতে হল পার্থকে। বলল, "উনি আমাদের সম্পর্কে কাকা হন।"

তাদের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল লোকটা। পার্থরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তার কিছু দূরে একটা পাথরের ভাঙা স্তম্ভ রাস্তার পাশে শোয়ানো ছিল। সেটা দেখিয়ে লোকটি বলল, "চলুন, ওই পাথরটার উপর একটু বসি। আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

পার্থ এবং অনিকেত লোকটির সঙ্গে গিয়ে বসল সেখানে। বসার পর লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আমার পরিচয় এখনও দেওয়া হয়নি আপনাদের। আমার নাম রানা বিক্রম সিংহ। আপনারা নিশ্চয়ই মহারানা কুম্ভের কথা শুনেছেন, আমি তাঁদের বংশধর।"

অনিকেত বলল, "আপনি যে রাজবংশধর এ কথা কাকা বলেছেন আমাদের। তবে আপনি যে মহারানা কুম্ভের বংশধর তা জানা ছিল না।"

অনিকেতের কথা শুনে এতক্ষণ পর পার্থও চিনতে পারল তাকে। বিক্রম সিংহ বললেন, "আপনাদের কাকা আর কিছু বলেননি আমার সম্পর্কে?"

অনিকেত বলল, "না।"

বিক্রম সিংহ এর পর একটু দোনোমনো করে বললেন, "পণ্ডিতজিকে আপনারা একটু বোঝান। গণপতিজি আমার প্রয়াত পিতার বন্ধু ছিলেন, তাঁকে আমি ঠকাব না। আমি তাঁকে পাঁচ লাখ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। আর সেখানে কিছু পেলে তারও একটা অংশ আমি তাঁকে দেব। প্রাসাদটা যেন তিনি আমাকেই দেন।"

অনিকেতরা বিক্রম সিংহের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। পার্থ বিক্রম সিংহকে বলল, "আমরা আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনি কোন প্রাসাদের কথা বলছেন?"

"আমি ঝুনঝুন প্রাসাদের কথা বলছি। পণ্ডিতজির বাড়ির উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে যে প্রাসাদটা রয়েছে," বললেন বিক্রম সিংহ।

অনিকেত অবাক হয়ে বলল, "ওই প্রাসাদের মালিক বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য?"

বিক্রম সিংহ বললেন, "কেন, আপনারা জানেন না সেটা।" তাঁর গলায় বিস্ময়ের সুর ঝড়ে পড়ল। এর পর উঠে দাঁড়ালেন বিক্রম সিংহ। ঠোঁটের কোনায় তাঁর চাপা হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "গণপতিজি বা পণ্ডিতজির মুখে আগে কিন্তু শুনিনি যে, তাঁর কোথাও কোনও ভাই আছে! যাই হোক, আমার কথাটা কিন্তু আপনারা চাচাজিকে বলবেন।"

ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হল বিক্রম সিংহের সেই দুই ঘোড়সওয়ার সঙ্গী। তাদের একজন বিক্রম সিংহের সেই কালো ঘোড়াটাকেও সঙ্গে করে এনেছে। বিক্রম সিংহ তাদের দেখে অনিকেতদের বললেন, "ওরা আমার দেহরক্ষী। আমাকে খুঁজতে এসেছে। আপনারা এবার যান, অনেকটা সময় নষ্ট হল আপনাদের। আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।"

অনিকেতরা উঠে পড়ল তাঁর কথা শোনার পর। তারপর তাঁকেও ধন্যবাদ জানিয়ে যখন রাস্তার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে, তখন বিক্রম সিংহ বললেন, "আরও দু'টো কথা বলবেন পণ্ডিতজিকে। তিনি যেন লকেশ সিংহের থেকে সাবধানে থাকেন, আর আমি কিন্তু ভূত বিশ্বাস করি না," এই বলে তিনি এগিয়ে গেলেন বাইকটার দিকে।

অনিকেতরা হাঁটতে শুরু করল নিজেদের গন্তব্যের দিকে। যেতে-যেতে পার্থ বলল, "লোকটি মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে, আমরা বিদ্যাপতিবাবুর কেউ হই না।"

অনিকেত বলল, "তাঁর ঠোঁটের কোনায় হাসি দেখে আমারও তাই মনে হল।"

পার্থ বলল, "ব্যাপারটা তোর কী মনে হল? বিক্রম সিংহ কথাগুলো আমাদের বললেন কেন?"

অনিকেত বলল, "আমাদের মাধ্যমে বিদ্যাপতিবাবুর কানে তাঁর কথাগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য," তারপর অনিকেত বলল, "তাঁর শেষের কথাটার মধ্যে কেমন যেন রহস্য লুকিয়ে আছে বলে আমার মনে হল।"

পার্থ বলল, "ওই ভূত বিশ্বাস না করার ব্যাপারটা তো! আমারও মনে হচ্ছে কথাটার অন্য কোনও তাৎপর্য আছে।"

কথা বলতে-বলতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অনিকেতরা এসে হাজির হল পদ্মিনী প্রাসাদের কাছে। প্রাসাদের চারপাশ খুব নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে-মাঝে কোথা থেকে একটা ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। ছোট্ট প্রাসাদ, মোরাম বিছানো পথ ধরে প্রাসাদের ভিতর ঢুকল। পথের দু'পাশে কাঠগোলাপের বাগান, বড়-বড় ফুল ফুটে আছে। ফুলের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস। মোরাম বিছানো রাস্তার দু'পাশে ছোট-ছোট ঘর। রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা প্রাচীরের

গায়ে। অনিকেতরা গিয়ে দাঁড়ল সেই প্রাচীরের সামনে। প্রাচীরের ওপাশে বেশ কিছুটা নীচে একটা ছোট্ট সরোবর। তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি প্রাসাদ। তার থেকে ধাপে-ধাপে সোপানশ্রেণি নেমে গিয়েছে সরোবরের জলে। এই সেই বিখ্যাত জলমহল। অনিকেতের মনে হল, বহুশ্রুত সেই কাহিনি। রূপসী রানি পদ্মিনীকে নিজের বিবি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলাউদ্দিন অবরোধ করে বসলেন চিতোরগড়। কিন্তু তিন মাস অবরোধ করার পরও যখন তিনি কেল্লায় ঢুকতে পারলেন না, তখন তিনি মহারানা লক্ষ্মণ সিংহের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, একবার মাত্র পদ্মিনীকে চোখের দেখা দেখতে চান। তার পরেই তিনি ফিরে যাবেন দিল্লির পথে। দুর্যোগ এড়াবার জন্য লক্ষ্মণ সিংহ রাজি হয়েছিলেন তাঁর প্রস্তাবে। তবে শর্ত ছিল, সুলতান একা ঢুকবেন কেল্লায় এবং আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাঁকে। সুলতান রাজি হলেন এই প্রস্তাবে। শর্ত অনুযায়ী একদিন সুলতানকে নিয়ে আসা হল পদ্মিনী প্রাসাদের একটা ঘরে। সেখানে রাখা ছিল বিশাল এক আয়না। দিনের শেষে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় জলমহলের সোপানশ্রেণি বেয়ে সরোবরের ধারে এসে দাঁড়ালেন রূপসী রানি। সরোবরের কাকচক্ষু জলে তাঁর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে ধরা দিল ঘরের মধ্যে রাখা আয়নায়। তাঁর অপার সৌন্দর্য দেখলেন সুলতান। পরে অবশ্য সুলতান তাঁর কথা রাখেননি। তিনি ধ্বংস করেন চিতোরগড়। আর পদ্মিনী জহরব্রত পালন করে কুম্ভ প্রাসাদের ভূ-গর্ভস্থ একটি ঘরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। মহাকালের সাক্ষী হয়ে আজও অনিকেতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাসাদ। দিনের শেষ, পড়ন্ত বিকেলের অস্তাচলগামী সূর্যের লালা আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট্ট সাদা জলমহলের মাথায়। এরকমই একসময় ছিল সেদিন, যখন আলাউদ্দিনকে দেখা দেওয়ার জন্য সোপানশ্রেণি বেয়ে স্বচ্ছ জলাশয়ের তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রূপসী রানি পদ্মিনী। জলমহলের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা বিষণ্ণতা নেমে এল অনিকেতের মনে। পার্থও তাকিয়েছিল সেদিকে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আলাউদ্দিন তো চিতোরের সব কিছু ধ্বংস করেছিলেন, তবে জলমহলকে ধ্বংস করেননি কেন?"

অনিকেত বলল, "হয়তো সুলতানের পাষাণ হৃদয়ে কিছু করুণার সঞ্চার হয়েছিল রানির মৃত্যুতে। তাই তিনি তাঁর স্মৃতিবিজড়িত জলমহলের কোনও ক্ষতি করেননি। এ ব্যাপারে ইতিহাসে তেমন কিছু লেখা নেই।"

"কী, আপনাদের জলমহল দেখা হল?" কথাটা শুনে পিছনে ফিরে তাকিয়ে অনিকেতরা দেখল, তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বিদ্যাপতি।

অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, হল।"

বিদ্যাপতি বললেন, "চলুন, তা হলে ফেরা যাক। আপনাদের ভাগ্য ভাল, বাজারে মাছও পেয়ে গেলাম। মাছ এখানকার বাজারে কখনওসখনও আসে।"

কোনও কথা না বলে অনিকেত আর পার্থ প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার জন্য বিদ্যাপতির পিছন-পিছন হাঁটতে শুরু করল। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা উঠে বসল টাঙায়।

॥ ৫ ॥

বিদ্যাপতির টাঙা ফিরে চলল তাঁর আস্তানার দিকে। সন্ধে নামছে চিতোরগড়ের বুকে। আস্তে-আস্তে অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে কেল্লার বুরুজ-মিনার-অলিন্দগুলোকে। একটু-একটু ঠান্ডাও লাগতে শুরু করেছে অনিকেতদের। বিদ্যাপতি ঠিকই বলেছিলেন। সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডা নামে এখানে। অনিকেতরা চুপচাপ বসে দু'পাশ দেখতে-দেখতে চলেছে। সারাদিনের পরিশ্রমে বিদ্যাপতির ঘোড়াটা মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার চলার গতি কিছুটা মন্থর। বিদ্যাপতিও কোনও কথা বলছিলেন না। মাঝে-মাঝে শুধু মুখ দিয়ে শব্দ করছিলেন তাঁর ঘোড়াটার উদ্দেশে। পার্থ একসময় ইশারা করল অনিকেতকে বিক্রম সিংহের ব্যাপারটা বিদ্যাপতিকে বলার জন্য। একটা গলাখাঁকারি দিয়ে অনিকেত বিদ্যাপতিকে বললেন, "আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।"

তার কথাটা মনে হয় কানে গেল না। পার্থর মনে হল, টাঙা চালাতে-চালাতে তিনি যেন অন্য কোনও চিন্তার মধ্যে ডুবে আছেন। অনিকেতরা টাঙায় ওঠার পর তাদের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। এমনিতে কিন্তু তিনি মিশুকে প্রকৃতির মানুষ, কথা বলতে ভালবাসেন। অনিকেত আবার বলল কথাটা। এবার তার কথা কানে গেল বিদ্যাপতির। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বলুন।"

অনিকেত বলল, "রানা বিক্রম সিংহের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, তিনি আপনাকে কিছু বলতে বলেছেন।"

কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালেন বিদ্যাপতি। হয়তো তাঁর হাতের লাগামে টান পড়ে গিয়েছিল, থেমে গেল তাঁর ঘোড়া। নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে ঘোড়াটাকে আবার চালাতে শুরু করে বিদ্যাপতি জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হল?"

অনিকেত ঘটনাটা বলল বিদ্যাপতিকে। বিক্রম সিংহ কী কী বলতে বলেছেন বিদ্যাপতিকে সে কথাও বলল অনিকেত। তার কথাগুলো কোনও কিছু না বলে চুপ করে শুনে গেলেন বিদ্যাপতি। অনিকেত আর পার্থ মনে করেছিল, কথা শোনার পর এ বিষয়ে মুখ খুলবেন বিদ্যাপতি। কিন্তু তিনি চুপচাপ টাঙা চালাতে লাগলেন। সম্ভবত কথাগুলো শোনার পর আরও গম্ভীরভাবে কিছু ভাবতে লাগলেন তিনি। পার্থ হঠাৎ বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সত্যি-সত্যি ওই প্রাসাদের মালিক?"

বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ, আমার উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ চণ্ডীপতি, বিক্রম সিংহের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ রানা বীরভদ্র সিংহের থেকে দেবত্তর সম্পত্তি হিসেবে লাভ করেন ওই প্রাসাদ। ওই প্রাসাদে একটা সরস্বতী মন্দির ছিল, চণ্ডীপতি ছিলেন সেখানকার পূজারি।"

পার্থ বলল, "আপনি তো তা হলে অনেক বড়লোক। একেবারে একটা প্রাসাদের মালিক!"

বিদ্যাপতি বললেন, "ইট-পাথরের স্তূপের মালিককে যদি বড়লোক ধরেন, তা হলে সে অর্থে আমি বড়লোক! আসলে বীরভদ্রের তো অনেক আগে এই প্রাসাদ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। মন্দিরটা অবশ্য সে সময় টিকে ছিল। আমার উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ উমাপতির আমলে সেটাও ধ্বংস হয়ে যায়। এখন শুধু রয়েছে প্রাসাদের দক্ষিণ মহলের কয়েকটা দোতলা ঘর আর সেই লাগোয়া একটা অলিন্দ। আর কিছু নেই।"

অনিকেত এবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, প্রাসাদটার নাম 'ঝুনঝুন প্রাসাদ' কেন?"

টাঙা চালাতে-চালাতে বিদ্যাপতি বললেন, "আসলে এই প্রাসাদের নাম 'সরস্বতী প্রাসাদ'। চিতোরের অন্য অনেক কিছুর মতো এই প্রাসাদও মহারানা কুম্ভ তৈরি করান। ঝুনঝুন নামে একসময় এক রাজ্য ছিল। মহারানা যেদিন ওই ঝুনঝুন রাজ্য জয় করেছিলেন, সেইদিন ওই প্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। এই জন্যে ওই প্রাসাদ ঝুনঝুন প্রাসাদ নামেও পরিচিত হয় এবং সরস্বতী প্রাসাদের চেয়ে ঝুনঝুন প্রাসাদ নামটাই বেশি খ্যাতি লাভ করে।"

অনিকেত বলল, "আপনাকে দু'টো প্রশ্ন করব? যদিও তার পিছনে কোনও কারণ নেই, নিছক কৌতূহল মেটাবার জন্যই জানতে চাই।"

বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ, করুন।"

অনিকেত বলল, "আমার প্রথম প্রশ্ন হল, ওই ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদ বিক্রম সিংহ কিনতে চাইছেন কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনিও বিক্রম সিংহ অত টাকা দিতে চাওয়া সত্ত্বেও প্রাসাদটা তাঁকে বিক্রি করছেন না কেন?"

টাঙা চালাতে-চালাতে গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে বিদ্যাপতি বললেন, "আপনাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল, ওঁর ধারণা ঝুনঝুন প্রাসাদে কোথাও গুপ্তধন লুকনো আছে। আর তাই খুঁজে বের করার জন্য উনি প্রাসাদটা কিনতে চাইছেন।"

বিদ্যাপতির কথা শুনে অনিকেতের মনে পড়ে গেল যে, এর ইঙ্গিত বিক্রম সিংহের কথাতেও ছিল। কারণ, বিক্রম সিংহ অনিকেতদের বলেছেন যে, সেখানে কিছু পেলে তার একটা অংশ তিনি বিদ্যাপতিকে দান করবেন। বিদ্যাপতি এর পর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ পার্থ জিজ্ঞেস করল, "ঝুনঝুন প্রাসাদে সত্যিই কি গুপ্তধন থাকতে পারে? আপনার কী মনে হয়?"

বিদ্যাপতি বললেন, "প্রাচীন প্রাসাদে গুপ্তধন পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে, এসব প্রাসাদকে কেন্দ্র করে যেসব গল্প শোনা যায়, সেগুলো সবই মিথ্যে রটনা। খোঁজাখুঁজিই সার হয়, মেলে না কিছুই।"

বিদ্যাপতির টাঙা এবার একটা বাঁক নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। বিদ্যাপতি বললেন, "এবার আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেব। যদিও ব্যাপারটা গোপনীয়, তবুও বিশ্বাস করে আপনাদের বলছি। কোনও সময় ইচ্ছে হলেও বিক্রম সিংহকে প্রাসাদটা আমি বিক্রি করতে পারব না। কারণ, প্রাসাদটা আমি একজনের কাছে বিক্রি করব বলে কথা দিয়েছি। আমি যদি প্রাসাদটা তার হাতে তুলে না দিই, তা হলে সে আমার ক্ষতি করতে পারে।"

"সে কি খুব ক্ষমতাবান ব্যক্তি?" জানতে চাইল অনিকেত।

বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ, তার নাম রানা লকেশ সিংহ। তিনি উদা'র বংশধর, জ্ঞাতিসূত্রে তিনি বিক্রম সিংহের কাকা হন। তাঁর নামে অনেক কানাঘুষো শোনা যায়। কেল্লার লোকজন বেশ ভয়

করে চলে তাঁকে।"

অনিকেত জিজ্ঞেস করল, "কোন উদা? কুম্ভপুত্র উদা? যে পিতাকে খুন করেছিল?"

"হ্যাঁ, সে-ই," বললেন বিদ্যাপতি।

তাঁর কথা শুনে পার্থ বলল, "আপনি অমন লোকের পাল্লায় পড়লেন কী করে?"

একটু চুপ করে থেকে বিদ্যাপতি বললেন, "সে এক লম্বা গল্প। আপনারা আমার স্বজাতি, আমার কোনও ক্ষতি করবেন না। তাই যে কথা আমি কোনও দিন কাউকে বলিনি, সেকথা আজ আমি আপনাদের বলব। বলব, কারণ, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের পরামর্শ চাই। কেল্লার কোনও লোকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে আমি ভরসা পাচ্ছি না। আমাকে একটু জল দিন, তারপর বলছি আমার কথা।"

বিদ্যাপতি থামিয়ে দিলেন তাঁর টাঙা। রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিকেতরা, যেখানে সকালবেলায় ময়ূর দেখেছিল তারা।

সন্ধে নেমে আসছে, আকাশে আস্তে-আস্তে ফুটে উঠছে গোল চাঁদ। সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দু'পাশের ধ্বংসস্তূপগুলো। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল অনিকেতরা। বোতল থেকে জল খেতে-খেতে বিদ্যাপতি বললেন, "চিতোরেশ্বরী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, সেখানে সন্ধ্যারতি শুরু হল।"

জল খাওয়ার পর আবার টাঙা চালাতে শুরু করে বিদ্যাপতি বললেন, "একটু আগে থেকেই বলি, তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে। বছর পাঁচেক আগের কথা, আমার দাদা গণপতি তখন বছর দু'-এক হল, উদয়পুরের এক মিউজিয়ামের কিউরেটরের চাকরি ছেড়ে কেল্লায় এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন। দাদা বরাবরই কেল্লার বাইরে তার আগে জীবন কাটিয়েছেন। বিয়ে-থা করেননি। কিউরেটরের চাকরির আগে জয়পুরের এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন। যাই হোক, কেল্লায় আসার পর তিনি পড়াশোনা নিয়েই সময় কাটাতেন, আর ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন কেল্লার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা খণ্ডহর প্রাসাদগুলোয়। তাঁর একজন সঙ্গী ছিলেন, তিনি হলেন বিক্রম সিংহের বাবা বিজয় সিংহ। তিনিও পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। কেল্লার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতেন। হঠাৎ একদিন তিনি খুন হয়ে যান।"

অনিকেত বিদ্যাপতির কথার মাঝে হঠাৎ বলল, "খুন! কেন খুন হয়েছিলেন তিনি?"

বিদ্যাপতি বললেন, "দাদা আর বিজয় সিংহ খুব বেড়াতেন বিভিন্ন প্রাসাদে। কীভাবে যেন রটে গিয়েছিল তাঁরা কোথাও কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন। সম্ভবত তাঁর মুখ থেকে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়ার জন্যই কেউ অপহরণ করে তাঁকে। সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর তাঁর মুণ্ডুহীন পচা-গলা মৃতদেহ গোমুখকুণ্ডের কাছে পাওয়া যায়। পোশাক দেখে শনাক্ত করা হয় তাঁকে। পুলিশ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অপরাধীর সন্ধান পায়নি।"

এরপর একটু দম নিলেন বিদ্যাপতি। টাঙা তাঁর বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। আর মিনিট পাঁচেকের পথ। বিদ্যাপতি বললেন, "এবার আমি আসল ঘটনায় অর্থাৎ লকেশ সিংহের ফাঁদে কীভাবে পড়লাম, বলছি। বিজয় সিংহের মৃত্যুর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দাদাও এক দুর্ঘটনায় পড়েন। একদিন বিকেলে বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়ে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না। পরদিন তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল ঝুনঝুন প্রাসাদে। তাঁর মাথায় পাথরের চাঙড় খসে পড়েছিল। অচৈতন্য দাদাকে লোকজনের সাহায্যে আমি প্রথমে নিয়ে যাই চিতোর হাসপাতালে। কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জয়পুরের এক হাসপাতালে। জয়পুর হাসপাতালে যখন তিনি পৌঁছন, তখন তিনদিন কেটে গিয়েছে, কিন্তু দাদার জ্ঞান ফেরেনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানাল, মাথায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। নইলে তাঁর জ্ঞান আর কোনও দিন ফিরবে না। এ কাজের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকার দরকার। দাদার টাকাকড়ি কোথায় আছে তা আমি কোনও দিন জানার চেষ্টা করিনি। এদিকে আমার কাছে কিছুই নেই বললেই চলে। মহা সমস্যায় পড়লাম আমি। চেনাশোনা লোকের কাছে হন্যে হয়ে টাকা ধারের জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু পাছে শোধ দিতে না পারি, সেই ভয়ে কেউই আমাকে অত টাকা ধার দিতে রাজি হল না। কারণ, আমার চাকরি নেই। কোনও স্থায়ী উপার্জনও নেই। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। টাকা জোগাড় করতে না পারায় যখন দাদাকে বাঁচানোর আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, ঠিক এমন একসময় একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির হন লকেশ সিংহ। লকেশ সিংহকে আমি তার আগে চিনলেও তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি আমাকে এক লক্ষ টাকা সুদে ধার দিতে পারেন, কিন্তু তার পরিবর্তে ঝুনঝুন প্রাসাদটা বন্ধক রাখতে হবে তাঁর কাছে। এ ছাড়া আরও দু'টো শর্ত আছে তাঁর। এক, পাঁচ বছরের মধ্যে আমি যদি টাকা শোধ করতে না পারি, তবে প্রাসাদটা তাঁকে লিখে দিতে হবে। দুই, এই টাকা ধার বা প্রাসাদ বন্ধক রাখার ব্যাপারটা অর্থাৎ চুক্তির ব্যাপারটা আমি আমৃত্যু কাউকে জানাতে পারব না। আমার তখন টাকার দরকার। আমি রাজি হয়ে গেলাম তাঁর প্রস্তাবে। তাঁর দেওয়া টাকাতেই আমি দাদাকে বাঁচিয়ে আনলাম, যদিও আঘাতের জন্যে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। বলাবাহুল্য, টাকাটা আমার পক্ষে এখনও শোধ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সুদে-আসলে এখন তা দু' লক্ষেরও বেশি হয়েছে। পাঁচ বছর শেষ হতে এখনও মাস দুয়েক বাকি আছে। কিন্তু ওই টাকা আমার পক্ষে শোধ দেওয়া আর সম্ভব নয়। দিন কুড়ি আগে তিনি এসেছিলেন আমার কাছে। কোথা থেকে তিনি যেন খবর পেয়েছেন যে, বিক্রম সিংহও প্রাসাদটা কিনতে চান। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি জানেন টাকা শোধ দেওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কিন্তু সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই যদি আমি প্রাসাদটা তাঁর হাতে তুলে দিই, তা হলে আজীবন মাসিক দু' হাজার টাকা করে আমাকে তিনি দিয়ে যাবেন। কোনও এক বিশেষ কারণে অতি দ্রুত নাকি ওই প্রাসাদ তাঁর দরকার।

এ প্রস্তাব ভাববার জন্য তিনি আমাকে কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা আজই শেষ হচ্ছে। আমার সিদ্ধান্ত জানতে আজ রাতেই আমার বাড়িতে তিনি আসবেন।"

টাঙা বিদ্যাপতির বাড়ির একদম কাছে চলে এসেছে। অনিকেত দেখতে পেল তার বাড়িটা। বিদ্যাপতি বললেন, "প্রাসাদটা কিন্তু লকেশ সিংহের হাতে তুলে দেওয়ার আমার কোনও ইচ্ছে নেই। লোকটিকে মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু কী করব? আমি ওঁর কাছে ফেঁসে গিয়েছি। একথা আমি বলতেও পারছি না বিক্রম সিংহকে। গোপনীয়তা ভঙ্গ করলে লকেশ সিংহ

আমাকে ছাড়বেন না। তিনি নাকি একবার একটা খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে না চাওয়ায় পুলিশের হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে যান।"

টাঙা এসে দাঁড়াল বিদ্যাপতির বাড়ির সামনে। টাঙা থেকে নামতে-নামতে বিদ্যাপতি বললেন, "সবই তো আপনাদের বললাম! এখন একটু ভেবে বলবেন, কী করা যায়? আমার সিদ্ধান্ত আজকেই তাঁকে জানাতে হবে।"

টাঙা থেকে লাফ দিয়ে নেমে অনিকেত বলল, "ঠিক আছে, দেখি অন্য কোনও রাস্তা বাতলানো যায় কিনা!"

টাঙা থেকে অনিকেত আর পার্থ নীচে নামার পর বিদ্যাপতি তাদের বসার আসনের তলা থেকে একটা বাজারভর্তি ব্যাগ বের করে পার্থর হাতে দিয়ে বললেন, "এটা একটু ধরুন! ঘোড়াটাকে গাড়ি থেকে খুলে তারপর দরজার তালা খুলছি। সারাদিন আজ বেচারার উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে।"

এই বলে ঘোড়া আর গাড়ির সঙ্গে বাঁধা চামড়ার ফিতেগুলো খুলতে শুরু করলেন তিনি। অনিকেত চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। চারপাশে নিঝুম পরিবেশ। দূরে জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে চাঁদের আলোয় ঝুনঝুন প্রাসাদটা বেশ অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল অনিকেত। পার্থ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ সে বিদ্যাপতিকে বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। বিক্রম সিংহ আপনাকে বলতে বলেছেন যে, তিনি ভূতে বিশ্বাস করেন না। এর কারণ কী?"

বিদ্যাপতি ঘোড়াটাকে গাড়ি থেকে খুলে ফিরে দাঁড়ালেন পার্থর দিকে। তারপর বললেন এক অদ্ভুত কথা, "ঝুনঝুন প্রাসাদে চাঁদনি রাতে এক ছায়ামূর্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তার দীর্ঘ শরীর, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পোশাকে ঢাকা, হাতে ধরা থাকে বিরাট এক বর্শা। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, ওই ছায়ামূর্তি আসলে নাকি মহারানা কুম্ভের প্রেতাত্মা। কুম্ভ ওরকম পোশাক আর বর্শা ব্যবহার করতেন। বিক্রম সিংহের ধারণা, আসলে ওই ছায়ামূর্তির ব্যাপারটা আমারই কারসাজি। ওখানে গুপ্তধন লুকনো আছে বলে আমি ভূতের ভয় দেখিয়ে কৌশলে মানুষদের ওই প্রাসাদ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি।"

তাঁর কথা শুনে অনিকেত জিজ্ঞেস করল, "কুম্ভ ওই প্রাসাদে সত্যিই থাকতেন নাকি?"

কোমর থেকে চাবির গোছা বের করতে-করতে বিদ্যাপতি বললেন, "ঝুনঝুন প্রাসাদকে কেন্দ্র করে কিছু প্রাচীন জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। সারাদিনের রাজকার্য শেষ হলে কেল্লার প্রান্তে নির্জন এই প্রাসাদে নাকি প্রতি সন্ধ্যায় চলে আসতেন মহারানা। তারপর প্রাসাদের কাছের মন্দিরে দেবী সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে মগ্ন হতেন সঙ্গীত ও কাব্য সাধনায়। কুম্ভের বীণার মূর্চ্ছনা প্রাসাদ থেকে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ত চারপাশে। কখনও প্রাসাদের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠে মহারানার গীতগোবিন্দ পাঠ। গভীর রাত পর্যন্ত এভাবে এই প্রাসাদে একাকী কাটাতেন তিনি। তাই মৃত্যুর পরেও নাকি ঝুনঝুন প্রাসাদের মায়া কাটাতে পারেননি মহারানা। আজও তাই তাঁকে দেখা যায়। আরও একটা জনশ্রুতি হল, পুত্র উদা'র ভয়ে নাকি মহারানা কুম্ভ কিছু দুর্মূল্য রত্নরাজি রাজপ্রাসাদ থেকে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন ঝুনঝুন প্রাসাদে। ঘুমন্ত অবস্থায় বৃদ্ধ মহারানা পাষণ্ড পুত্র উদা'র ছুরির আঘাতে নিহত হন। এখনও নাকি সেই গুপ্তধন লুকনো আছে ওই প্রাসাদে। বর্শা হাতে সেই গুপ্তধনই নাকি পাহারা দেন মহারানা কুম্ভের প্রেতাত্মা।"

কথা বলতে-বলতেই দরজার তালা খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বিদ্যাপতি। তারপর তিনি একটা লণ্ঠন জ্বালালেন। বিদ্যাপতির পিছন-পিছন বাড়ির ভিতরে নিজেদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনিকেত ও পার্থ। উঠোনের ভিতরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। গণপতির ঘরটার দিকে একবার চোখ গেল অনিকেতের। দরজা-জানলা সব বন্ধ। ঘরের ভিতরেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিদ্যাপতি তাঁর এবং অনিকেতের ঘরের মাঝে মাটিতে লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখলেন। পার্থ বাজারের ব্যাগটা বিদ্যাপতির হাতে দিয়ে শিকল খুলে ঘরের ভিতর ঢুকল। অনিকেত ঘরে ঢোকার আগে বিদ্যাপতিকে বলল, "আপনি বরং লকেশ সিংহের কাছ থেকে আরও দু'-তিনদিন সময় চেয়ে নিন। তা হলে ভাল করে ভাবার সময় পাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা," বলে নিজের ঘরের শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন বিদ্যাপতি।

অনিকেতও ঢুকল নিজেদের ঘরের ভিতর। পার্থ ঘরের ভিতরে ঢুকে জানলাটা খুলে দিল। অনিকেত গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে। চাঁদের আলোয় তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে জেগে থাকা ঝুনঝুন প্রাসাদ।

॥ ৬ ॥

রাত সাড়ে ন'টা বাজে। বিদ্যাপতির ঘরের তক্তাপোশে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বিদ্যাপতির পাণ্ডুলিপি পাঠ শুনছিল অনিকেত আর পার্থ। তারা দু'জনে বসেছে একপাশে, আর অন্য পাশে লণ্ঠনের সামনে একটা জলচৌকির উপর পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বিদ্যাপতি। লণ্ঠনের আলোয় একের পর-এক অনুচ্ছেদ পাঠ করে চলেছেন। শুনতে খুব একটা মন্দ লাগছে না অনিকেত আর পার্থর। হয়তো বইটা ছাপানো যেতে পারে। তবে অনিকেতের মনে হল, প্রামাণ্য ইতিহাসের তুলনায় লেখাটায় স্থানীয় উপকথা বা লোকগাথার প্রাধান্যই বেশি। বিদ্যাপতির সঙ্গে পার্থ আর অনিকেতের কথা হয়েছে। লেখাটা শোনার পর প্রাথমিকভাবে যদি তা পছন্দ হয়, তবে সেটা তারা কলকাতায় নিয়ে যাবে। এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞ লোককে দেখাবার পর তাঁর সম্মতি পেলে ছাপাবার চেষ্টা করবে। আর অমোনীত হলে পাণ্ডুলিপিটা ডাকযোগে বিদ্যাপতিকে পাঠিয়ে দেবে।

মন দিয়ে বিদ্যাপতির লেখা শুনছিল অনিকেত। বিদ্যাপতি তখন সংগ্রাম সিংহের কাহিনি পাঠ করছেন, "যুদ্ধ জয় করে কেল্লায় ঢুকেছেন সংগ্রাম। সূর্যতোরণের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজপুত কুলনারীরা শঙ্খধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টি করছেন তাঁর উদ্দেশে। মহারানার ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন কুলপুরোহিত। হাতে তাঁর চিতোরেশ্বরী মন্দিরের পবিত্র হোমাগ্নি। মহারানা স্পর্শ করবেন তা। পুরোহিত হোমাগ্নির পাত্র তুলে ধরলেন ঘোড়ার পিঠে বসা মহরানার দিকে। মুহূর্তের জন্য

কেমন যেন থমকে গেলেন মহারানা। তারপর বাঁ হাত দিয়ে সেই পবিত্র অগ্নি স্পর্শ করে সেই হাত নিজের মাথায় ছোঁয়ালেন। কিন্তু বাঁ হাত কেন! বৃদ্ধ কুলপুরোহিতের দৃষ্টি পড়ল মহারানার ডান হাতের দিকে। তিনি দেখলেন, মহারানার ডান হাতটা কব্জির নিচ থেকে আর নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি হারিয়েছেন সেটি। অথচ তার জন্য মহারানার চোখে-মুখে কোনও কষ্টের ছাপ নেই। বরং তাঁর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে যুদ্ধজয়ের আনন্দ," এই পর্যন্ত পাঠ করে হঠাৎ থেমে গেলেন বিদ্যাপতি।

অনিকেত আর পার্থর কানে গেল, কে যেন বাইরের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কানখাড়া করে শব্দটা শোনার পর বিদ্যাপতি বললেন, "নিশ্চয়ই লকেশ সিংহ। তাঁর এসময়ই আসার কথা।"

তাঁর কথা শুনে অনিকেত বলল, "সময় নেওয়ার ব্যাপারটা মনে আছে তো? আমরা এখানে বসব, না নিজেদের ঘরে ফিরে যাব?"

বিদ্যাপতি প্রথমে বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে। আরও তিনটে দিন সময় চেয়ে নেব আমি," তারপর বললেন, "আপনাদের এখানে বা পাশের ঘরে থাকার দরকার নেই। আপনারা আমার সঙ্গে বাইরের ঘরে চলুন। যাঁর কথা এত শুনলেন, তাঁকে একবার দেখবেন না?"

তক্তাপোশ থেকে নামতে-নামতে অনিকেত বলল, "ঠিক আছে চলুন, দেখি তাঁকে।"

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সেই ঘর ছেড়ে বিদ্যাপতি হাজির হলেন বাইরের ঘরে। তাঁর সঙ্গে গেল অনিকেত এবং পার্থ। তারা গিয়ে দাঁড়াল ঘরের কোনায়। দরজা খুলে দিলেন বিদ্যাপতি। যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর দীর্ঘ চেহারা। পরনে পুরোদস্তুর রাজস্থানী পোশাক। পায়ে নাগরা, কানে দুল, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'লোঙ'। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে একটা লম্বা তরবারি। ঘরের মাঝখানে দরজার ঠিক উলটো দিকে গোটা দুয়েক চেয়ার রাখা আছে। তিনি ঘরে ঢুকে বসলেন তারই একটায়। দরজার পাল্লাটা বন্ধ করে লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন বিদ্যাপতি। লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে লোকটির মুখে। তাঁর চেহারায় যে দু'টো জিনিস অনিকেতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হল তাঁর পেল্লাই গোঁফ আর মুখের ডান দিকে কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত নেমে আসা লম্বা কাটা দাগ। লোকটির বয়স মনে হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। চেয়ারে বসার পর লকেশ সিংহ বিদ্যাপতিকে বললেন, "কী ঠিক করলে পণ্ডিত? আমি কিন্তু কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছি।"

বিদ্যাপতি তাঁর কথা শোনার পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তর না পেয়ে লকেশ সিংহ বিদ্যাপতিকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা অনিকেতদের উপর। ঘরের মধ্যে তাদের উপস্থিতি এতক্ষণে তিনি খেয়াল করলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পার্থ খেয়াল করল, লকেশ সিংহের ডান হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে আড়াআড়ি চলে গেল তরবারির হাতলে। তাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর লকেশ সিংহ বিদ্যাপতিকে বললেন, "এরা কারা? তোমার এখানে তো কারওর থাকার কথা নয়!"

বিদ্যাপতি বললেন, "ওঁরা আমার আত্মীয়। কলকাতা থেকে কয়েকদিনের জন্য কেল্লায় বেড়াতে এসেছেন।"

লকেশ সিংহ বললেন, "তোমার আত্মীয় আছে জানা ছিল না!"

অনিকেতরা বুঝতে পারল, স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুর ঝরে পড়ল লকেশ সিংহের গলায়। লকেশ সিংহ এর পর জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কাছে খবর আছে, আজ বিকেলে দু'জন বাইরের লোকের

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়িকা বই

যাদের কোনো বিকল্প নেই !

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ইংরাজী সহায়িকা

প্রান্তিক
স্কুল বইয়ের জগতে নতুন পথের দিশারি
১৮, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২
২৩৫৪-৬২১১, ২৩৬০-৮১১৬/১৭
PRASA-07

সঙ্গে কথা বলছিল বিক্রম, এ দু'জন তারা নয় তো?"

মিথ্যে বললেন বিদ্যাপতি, "না, বিক্রম সিংহকে ওঁরা চেনেন না।"

"না চেনাই ভাল!" বললেন লকেশ সিংহ।

বিদ্যাপতি এবার একটু ইতস্তত করে লকেশ সিংহকে বললেন, "আমাকে আরও তিনটে দিন সময় দিতে হবে," তারপর অনিকেতদের দেখিয়ে তিনি লকেশ সিংহকে বললেন, "ওরা ফিরে যান, তারপর আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব।"

বিদ্যাপতির কথা শুনে লকেশ সিংহ কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, তিনদিন পরই আসব আমি। তবে সেদিন কিন্তু খালি হাতে ফিরব না!" এই বলে লকেশ ঘর ছেড়ে চৌকাঠের বাইরে পা রাখতে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালেন, তারপর অনিকেতদের বললেন, "তোমরা কেল্লা দেখতে এসেছ, কেল্লা দেখে ফিরে যাবে। তার বেশি কোনও কিছুতে নাক গলাতে যাবে না। তাতে বিপদ হবে। আর পণ্ডিত, তোমার অবস্থা হবে বিজয় সিংহের মতো," এই বলে বিদ্যাপতির দিকে তাকিয়ে একটা বাঁকা হাসি হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন লকেশ সিংহ।

লকেশ সিংহ বেরিয়ে যাওয়ার পর অনিকেত গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বিদ্যাপতি ঘরের মাঝে একই জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনিকেত দরজাটা বন্ধ করার পর বিদ্যাপতি বললেন, "দেখলেন তো, যাওয়ার সময় কেমন হুমকি দিয়ে গেল? মনে হয়, ওঁকে প্রাসাদটা দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।"

অনিকেত তাঁর কথার কোনও উত্তর দিল না। পার্থ এবার বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওঁর মুখের কাটা দাগটা কিসের?"

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে যেতে-যেতে বিদ্যাপতি বললেন, "অসম্ভব সাহস এই লোকটির। চিতোরে ওঁর চেয়ে বড় তলোয়ারবাজ আর কেউ নেই। যুবা বয়সে উনি একবার বন্ধুদের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে আরাবল্লির জঙ্গলে বুনো শূকর শিকারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি হঠাৎ এক দাঁতালের মুখোমুখি পড়েন। দাঁতাল শূকর বড় সাংঘাতিক। মরবার আগে সে তার হত্যাকারীকে নিয়ে মরতে চেয়েছিল। কিন্তু নেহাতই বরাত জোরে বেঁচে যান লকেশ সিংহ। তবে সেই লড়াইয়ের চিহ্ন সারা জীবনের জন্য আঁকা হয়ে যায় লকেশ সিংহের মুখে।"

তাঁর কথা শুনে পার্থ বলল, "সত্যিই তা হলে লোকটি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির, প্রচণ্ড সাহস আছে বলতে হবে!"

বিদ্যাপতি বললেন, "হ্যাঁ, সকলে সে কথাই বলে।"

বিদ্যাপতির ঘরে ঢুকে অনিকেতরা যখন তক্তাপোশের উপর আবার বসতে যাচ্ছে, ঠিক তখন তাদের কানে এল গণপতির গলা, "বিদ্যা, আমার আজ খিদে পেয়েছে। আমাকে খেতে দে।"

বিদ্যাপতি তক্তাপোশে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়েছিলেন। গণপতির গলা কানে যেতেই তক্তাপোশ থেকে নেমে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনিকেত আর পার্থও বাইরে এসে দাঁড়াল। গণপতির ঘরের দরজা-জানলা আগের মতোই বন্ধ আছে। বিদ্যাপতি সেই বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে একটু জোরে বললেন, "তোমার খাবার দিচ্ছি দাদা।"

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর আবার শোনা গেল গণপতির গলা, "তাড়াতাড়ি দে, খাওয়ার পর আমি ঝুনঝুন প্রাসাদে যাব। রানা আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।"

অনিকেত বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞেস করল, "উনি কি বাড়ির বাইরে যান নাকি?"

বিদ্যাপতি বললেন, "না, ওঁকে আমি বাড়ির বাইরে যেতে দিই না।"

পার্থ বলল, "তা হলে যে উনি প্রাসাদে যাওয়ার কথা বললেন?"

বিদ্যাপতি বললেন, "আসলে আজ তো পূর্ণিমা! অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ওঁর মাথাটা একটু বেশি গন্ডগোল হয়ে যায়। এরকম নানা ভুলভাল কথা বলতে থাকেন তখন।"

অনিকেত এবার বলল, "রানা বলতে উনি কার কথা বললেন? রানা কুম্ভের?"

বিদ্যাপতি বললেন, "না, রানা মানে রানা বিজয় সিংহ। তাঁকে শুধু 'রানা' বলেই সম্বোধন করতেন দাদা।" এর পর বিদ্যাপতি অনিকেতদের বললেন, "আপনারা একটু আপনাদের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি ওঁকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করি। আজ অনেক দিন পর দাদা নিজে থেকে খেতে চাইলেন," এর পর তিনি অনিকেতকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ক'টা বাজে?"

ঘড়ি দেখে অনিকেত বলল, "দশটা বাজতে পাঁচ।"

তাই শুনে বিদ্যাপতি বললেন, "তা হলে খুব বেশি রাত হয়নি এখনও। আমার আধঘণ্টা মতো সময় লাগবে। তারপর আমি আপনাদের আবার পাণ্ডুলিপিটা শোনাতে বসব।"

অনিকেত বলল, "ঠিক আছে! রাত বারোটার আগে বাড়িতে আমি ঘুমোই না।"

বিদ্যাপতি গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। তিনি চলে যাওয়ার পর পার্থ বলল, "আমি বরং ঘরে গিয়ে খাটে বসি। পা দু'টো বড্ড টনটন করছে।"

এই বলে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল পার্থ। অনিকেত একা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। আকাশে বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় ভেসে যাচ্ছে সারা উঠোন। অনিকেত তাকিয়ে রইল চাঁদের দিকে। তার মনে পড়ে গেল, ঠাকুরমার কথা। ছেলেবেলায় অনিকেতকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখিয়ে তাকে চাঁদের চরকাকাটা বুড়ির গল্প শোনাতেন সেই ঠাকুরমা। চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেই ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ে যেতে লাগল তার।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ কানে যেতে চিন্তাজাল ছিন্ন হল অনিকেতের। সে দেখল, কখন যেন খুলে গিয়েছে গণপতিবাবুর ঘরের জানলাটা। ঘরের ভিতর থেকে তিনি উঁকি মারছেন। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। সেই আলোয় তাঁর বুক পর্যন্ত নেমে আসা সাদা দাড়ি ধবধব করছে। তিনি তাকিয়ে আছেন অনিকেতের দিকে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর অনিকেত বুঝতে পারল, বৃদ্ধ ডান হাত তুলে ইশারায় তাকে কাছে ডাকছেন। একটু ইতস্তত করে অনিকেত ধীরে-ধীরে গিয়ে দাঁড়াল তাঁর জানলার সামনে। এবার সে একদম কাছ থেকে দেখতে পেল বৃদ্ধকে। তাঁর এলোমেলো সাদা চুলের ফাঁক দিয়ে কপালের

একপাশে উঁকি মারছে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। তাঁর শরীরে কাপড় প্রায় কিছুই নেই। শুধু একটা সাদা কাপড়ের ফালি জড়ানো রয়েছে কোমরে। অনিকেত কাছে যাওয়ার পর বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি গুপ্তধন খুঁজতে এসেছ?"

অনিকেত বলল, "না, আমরা বেড়াতে এসেছি।"

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, "বেড়াতে... বেড়াতে... রানা আর আমিও বেড়াতে যেতাম।"

অনিকেত তাকিয়ে রইল বৃদ্ধর দিকে। বৃদ্ধ বললেন, "আমার ঘরের দরজা খুলে দাও। আমি ঝুনঝুন প্রাসাদে বেড়াতে যাব।"

অনিকেত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আপনার ভাই খাবার নিয়ে আসছেন। তিনি খুলে দেবেন।"

বৃদ্ধ এর পর ধীরে-ধীরে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। জানলার কাছ থেকে সরে আসতে যাচ্ছিল অনিকেত, হঠাৎ সে শুনতে পেল, ঘরের ভিতর থেকে হেসে উঠলেন গণপতিবাবু। আবার দাঁড়িয়ে পড়ল অনিকেত। সে শুনতে পেল ঘরের ভিতর থেকে গণপতিবাবু নিজের মনে বলছেন, "সকলেই ভেবেছে পোশাক দেখিয়ে আমাকে ধোঁকা দেবে! কুম্ভের গুপ্তধন খোঁজা অত সহজ নয়! ভগবতীর মুখ দিয়ে ঢুকতে হয় তাঁর উদরে, সেখানেই সরস্বতীও আছেন, লক্ষ্মীও আছেন... এক দেবী নকল... তাঁকে পাহারা দেন নকল কুম্ভ..."

এর পর আরও কীসব কথা বললেন গণপতিবাবু। কিন্তু সেগুলো আর স্পষ্টভাবে কানে এল না অনিকেতের। সম্ভবত কথা বলতে-বলতে ঘরের অন্য পাশে চলে গেলেন তিনি। অনিকেত দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কথাগুলো কি নিছক পাগলের প্রলাপ, নাকি অন্য কিছু? হঠাৎ পার্থর গলা তার কানে এল, "অনি, একবার ভিতরে আয়।"

অনিকেত ঢুকল তাদের ঘরে। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পার্থ। সে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতে পার্থ বলল, "ওই শিমুলগাছটার দিকে তাকা।"

বিদ্যাপতিবাবুর বাড়ি থেকে একটু দূরে জঙ্গল যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে একটা বাজে-পোড়া পাতাহীন শিমুলগাছ আছে। অনিকেত দেখতে পেল, সেই শিমুলগাছের নীচে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক ঘোড়সওয়ার। ঠিক পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে ঘোড়াটার গা থেকে। মাঝে-মাঝে লেজটা নাড়ছে সে। লোকটার মাথাটা নীচের দিকে ঝোঁকানো। এত দূর থেকে তাকে চেনা যাচ্ছে না। পার্থ বলল, "লোকটা অনেকক্ষণ থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে এ বাড়িটার উপর নজর রাখছে।"

অনিকেত বলল, "লোকটা কে হতে পারে? লকেশ সিংহের চর নয় তো?"

পার্থ বলল, "আমার কিন্তু দেখে অন্য একজনের কথা মনে হচ্ছে। লক্ষ করে দ্যাখ, ঘোড়াটার সামনের দু'টো পায়ের নীচের দিকে সাদা ফেট্টি জড়ানো আছে। বিক্রম সিংহের ঘোড়ার পায়েও আমি ওরকম ফেট্টি দেখেছি। আর লোকটির চেহারাও ওঁরই মতো।"

অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, এবার আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বারান্দার ভিতর থেকে শিকল খোলার শব্দ কানে এল। তারপর বিদ্যাপতিবাবুর গলার অস্পষ্ট শব্দ। গণপতিবাবুকে সম্ভবত খাবার দিচ্ছেন বিদ্যাপতি। অনিকেত আর পার্থ জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল সেই ঘোড়সওয়ারের দিকে। মিনিট পাঁচেক পর ঘোড়সওয়ার একটু নড়ে উঠল। তারপর তার ঘোড়ার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে তাদের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিদ্যাপতিবাবু তাদের বললেন, "এবার আসুন, আমার কাজ হয়ে গিয়েছে।"

জানলার কাছ থেকে ঘরের বাইরে এল দু'জন। অনিকেত যখন বিদ্যাপতিবাবুর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, তখন সে একবার তাকাল গণপতিবাবুর ঘরের দিকে। সেই ঘরের দরজাটা খোলা। ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। মোম জাতীয় কোনও ছোট আলো সম্ভবত জ্বলছে সেখানে। খাওয়া সারছেন হয়তো গণপতিবাবু।

তক্তাপোশে বসার পর অনিকেত বিদ্যাপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ঝুনঝুন প্রাসাদের প্রেতাত্মার ব্যাপারটা আপনি নিজে বিশ্বাস করেন?"

অনিকেতের প্রশ্ন শুনে চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন বিদ্যাপতি। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, "হ্যাঁ করি, কারণ আমি তাঁকে দেখেছি।"

তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল পার্থ আর অনিকেত। পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

উত্তর দেওয়ার জন্য সোজা হয়ে বসলেন বিদ্যাপতি। তারপর বললেন, "মাস ছয়েক আগে এরকমই এক চাঁদনি রাতে দরজা খোলা পেয়ে দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করলেন জঙ্গলের দিকে। তাঁর পিছন-পিছন ছুটতে-ছুটতে একসময় আমি গিয়ে হাজির হলাম এই ঝুনঝুন প্রাসাদের কাছে। তখনই আমি দেখতে পেলাম তাঁকে। চাঁদনি রাতে বর্শা হাতে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন অলিন্দে, ঋজু, বলদীপ্ত ভঙ্গিতে," এই বলে চুপ করে গেলেন বিদ্যাপতি।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "তারপর কী হল?"

বিদ্যাপতি বললেন, "ভয়ে আমার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে যায় সেই ছায়ামূর্তি। তারপর ধীরে-ধীরে বাড়ি ফিরে আসি। দাদাকে আর সে রাতে খোঁজা হয়নি আমার। পরদিন সকালে তিনি আবার নিজেই ফিরে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, সারারাত তিনি কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, ঝুনঝুন প্রাসাদে রানার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।"

বিদ্যাপতির কথা শুনে পার্থ কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা তিনজনই হঠাৎ শুনতে পেল, বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। তাই শুনে বিদ্যাপতি বললেন, "এত রাতে আবার কে এল? লকেশ সিংহ ফিরে এল না তো?"

বিদ্যাপতির গলাটা কাঁপা-কাঁপা শোনাল। মনে হল, তিনি ভয় পেয়েছেন। পার্থ তাই বলল, "ভয় পাচ্ছেন কেন? প্রাসাদটা হস্তগত করা লকেশ সিংহের মূল উদ্দেশ্য। তিনি মুখে যাই বলুন, প্রাসাদটা হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত কোনও ক্ষতি আপনার হবে বলে মনে হয় না।"

অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। চলুন, দেখা যাক! অন্য কেউও হতে পারে!"

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

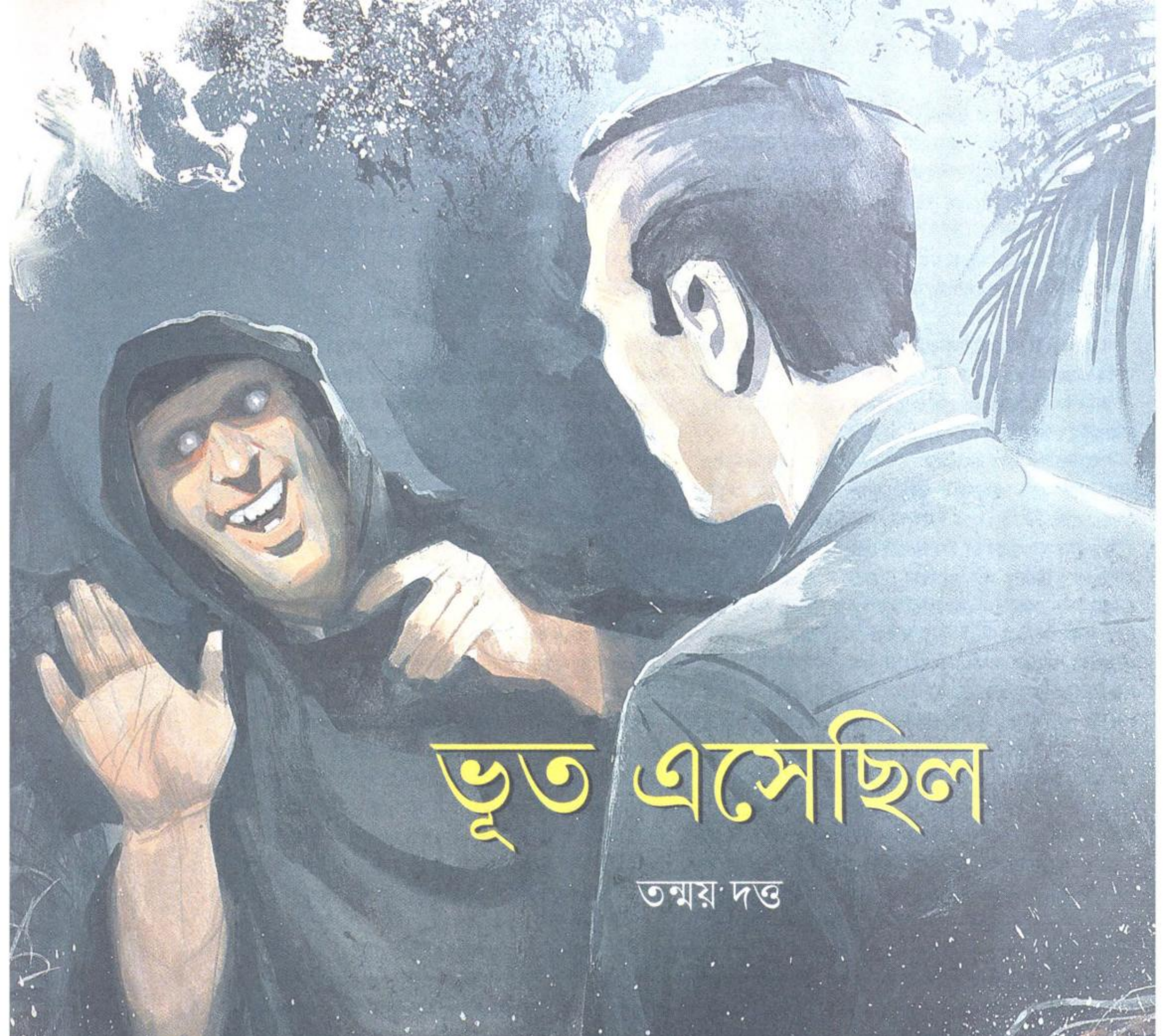

ভূত এসেছিল

তন্ময় দত্ত

প্রতিবছরই বড়দিনের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাব-যাব করে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। কারণ, বড়দিনের ছুটির আগে স্কুলের সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষা শেষ হয়, আর এই এক সপ্তাহের ছুটিতেই চেক করতে হয় পরীক্ষার সমস্ত খাতা। তাই ছুটিটাই মাটি হয়।

ও হো, বলাই হয়নি! আমি একজন স্কুলশিক্ষক। উত্তর কলকাতার একটি স্কুলে ভূগোলের শিক্ষকতা করি। অকৃতদার, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, চুলে অল্প পাকও ধরেছে। তিনকুলে শুধু এক বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন। তিনিও গত হয়েছেন তিন বছর হল। বাড়িতে এখন মেম্বার বলতে, আমি আর আমার দিন-রাতের কাজেরলোক বংশীবদন।

এ বছর স্কুলে ভূগোলের একজন নতুন শিক্ষক এসেছেন। তাঁকেই আমার ভাগের খাতাগুলো দেখতে দেওয়া হয়েছে। তাই ভাবলাম, এবারের ছুটিতে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি।

আমার অনেক দিনের প্রতিবেশী বিনোদডাক্তার বছরখানেক হল এখানকার বাড়ি বিক্রি করে মেদিনীপুরের ওদিকে বাড়ি করে চলে গিয়েছেন। জায়গাটার নাম রামজীবনপুর। উনি অনেকবার ওঁর বাড়ি যেতে লিখেছেন, কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি। শুনেছি জায়গাটা পাড়াগাঁ হলেও বেশ শান্ত-সুন্দর পরিবেশ। তাই ওঁর বাড়িই যাব ঠিক করে বিনোদবাবুকে একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলাম। কয়েক দিন পর তার উত্তরও এসে গেল। কীভাবে যেতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণের শেষে ভদ্রলোক তাঁর অনেক দিনের সাধপূরণ হওয়ার আনন্দও প্রকাশ করেছেন। আর এ-ও লিখেছেন যে, কবে নাগাদ আমি আসব সেটা জানালে স্টেশনে উনি লোক পাঠিয়ে দেবেন। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। পঁচিশ ডিসেম্বর আমি আসছি জানিয়ে বিনোদবাবুকে আর-একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে দরকারি সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বংশীকে সবকিছু বুঝিয়ে

দিয়ে ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম। বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু মাঝপথে হল বিপত্তি। কী যেন একটা পলিটিক্যাল ইসুতে রেললাইন অবরোধ করা হয়েছে। সেই অবরোধ উঠতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তারপর আবার যখন ট্রেনের চাকা নড়ল তখন প্রায় বিকেল গড়িয়ে এসেছে। পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রায় সাড়ে ছ'টা বেজে গেল।

শীতের সন্ধে, তাই এরই মধ্যে চারদিক সব ঝাপসা হয়ে এসেছে। ঠান্ডাটাও আজ বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে।

এই স্টেশনটা খুব ছোট্ট, নাম রহিমগঞ্জ। দু'-একটা চায়ের দোকান ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই বলা যায়। যে গুটিকয়েক যাত্রী ট্রেন থেকে নামল, তারা অধিকাংশই স্থানীয় লোক। তাই ট্রেন আসার সঙ্গে-সঙ্গে স্টেশনে যে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল, তা মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, যদি বিনোদবাবুর বাড়ি থেকে কেউ নিতে এসে থাকে। কিন্তু না, হয় তিনি আমার দ্বিতীয় চিঠিটা পাননি, আর না হয় স্টেশনে অপেক্ষা করে-করে ফিরে গিয়েছে তাঁর লোক। দু'টোরই আশঙ্কা সমান। আশপাশে চায়ের দোকানগুলো ছাড়া আর যে উল্লেখযোগ্য জিনিসটি চোখে পড়ল, তা হল স্টেশনমাস্টারের টিনের ঘরখানা। এখন এই বিপদে ওটাই মস্ত ভরসা। এখন বোধ হয় লোডশেডিং চলছে, তাই স্টেশনের বাতিগুলোও সব জ্বলছে না।

আমি ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে গুটিগুটি স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরের মধ্যে জ্বলছে দু'খানা হ্যারিকেন, রয়েছে ছড়ানো-ছেটানো কিছু আসবাব আর দু'টো বড়-বড় জংধরা লোহার আলমারি। এটাই স্টেশনমাস্টারের ঘর কাম টিকিট কাউন্টার। এক ভদ্রলোক আপাদমস্তক জুতো-মোজা-ধুতি-সোয়েটার-মাফলার-মাঙ্কিক্যাপ মুড়ে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। ইনিই বোধ হয় স্টেশনমাস্টার।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু গলাখাঁকারি দিতেই ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "ভিতরে আসেন।"

ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোককে নমস্কার জানাতেই পান খাওয়া দাঁতে হেসে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন, "বসেন, বসে, দাঁইড়ে ক্যান? কয়েন, আপনাগো লগে কী কত্তে পারি?"

আমি একটা হাতলভাঙা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম, "আমার নাম নিখিলকুমার বসু। কলকাতা থেকে আসছি।"

ভদ্রলোক দু' হাতের তালু ঘষে গরম করতে-করতে বললেন, "তা ইদিকে পরথমবার আইসছেন মনে হইতাসে। যাইবেন কোথা?"

"হ্যাঁ, প্রথমবারই বটে। যাব রামজীবনপুরে এক পরিচিতের বাড়ি। চিঠি দিয়ে আগে থেকে জানিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম স্টেশনে কেউ নিতে আসবে। কিন্তু...আসলে পথঘাট তো অচেনা।"

ভদ্রলোক মুখে চুকচুক শব্দ করে বললেন, "তা হইলে তো বড় বিপাকে পইড়াছেন কইতে হইব!"

"কেন কেন?"

"না, আসলে ইখানে সাঁঝের পরে অ্যামনিতেই পথঘাট সব শুনশান হইয়া যায়। তায় আবার ইখানকার রিকশাওয়ালারা আইজকে এসট্রেরাইক ডাকসে। অতএব রিকশাও পাইবেন না। তা ছাড়া কয়দিন যাবৎ রোজই এমন সময় লোডশেডিং হইতাসে... তাই কইতেসিলাম এঁজ্ঞে।"

মনে-মনে ভাববার চেষ্টা করলাম যে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম? কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। পাঁজিতে বোধ হয় আজ 'যাত্রা অশুভ' লেখা ছিল। ভদ্রলোক আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, "কী ভাবতাসেন?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "না! দেখছি ধর্মঘট, স্ট্রাইক আর অবরোধ করেই শেষপর্যন্ত দেশটা উচ্ছন্নে যাবে।"

"সইত্য, খাঁটি কথা একখান কইসেন... আপনাগো কলকেতা শহর তো ওই মড়কেই ম'ল, তাই না! তা মশায়ের কাজকারবার কী করা হয়?"

"কলকাতায় একটা সেকেন্ডারি স্কুলে পড়াই।"

"ও হো, ইশকুলমাস্টারি করেন। ভাল-ভাল। তা রামজীবনপুরে কার বাসায় যাইবেন, কইলেন না তো!"

"না, মানে... আপনি কি ঠিক চিনবেন?"

ভদ্রলোক মিটিমিটি হেসে বললেন, "দ্যাখেন, ইদিকে মোট দুইখান গেরাম, রামজীবনপুর আর হরিদেবপুর। আর এই দু'-গাঁয়ের যত মানুষ, সক্কলে এই ইস্টিশন মারফত সদরে যাতায়াত করে। অতএব এই নিধিরাম ধাড়া চেনে না, অমন মানুষ একখানও পাইবেন না এ তল্লাটে।"

আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, "আজ্ঞে, আমি যাব বিনোদবাবুর বাড়ি।"

"কোন বিনোদ? বাঁড়ুজ্জে, না গুপ্ত?"

"বাঁড়ুজ্জে, মানে ডাক্তার বিনোদ ব্যানার্জি।"

ভদ্রলোক গাল ফুলিয়ে হেসে বললেন, "ও হো হো! আমাগো ডাক্তারবাবু, ওই

যিনি কলকেতায় হাড়ের ডাক্তারি কত্তেন, অথোপেডিক সাজ্জেন, এইবার চিনসি। কিন্তু সে তো ইখান থেকে হাঁটা প্রায় পৌনে ঘন্টার পথ। অ্যাত্তটা রাস্তা এই আঁধারে আপনি যাইবেন...তা ছাড়া পথটাও বিশেষ ভাল নয় কিনা!"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "কেন বলুন তো? চোর-ডাকাতের খুব উপদ্রব নাকি?"

"আরে না না, কী যে কয়েন। ওসব কিস্‌সু না। আসলে ও পথে একটু তেনাদের উপদ্রব আছে কিনা!"

"তেনাদের মানে? ভূতেদের?"

"আরে, রাম-রাম-রাম। ভরসাঁঝেরবেলা তেনাদের নাম মুখে আনতে নাই। আপনি একখান লোক মশাই...রাম-রাম-রাম।"

"দেখুন নিধিরামবাবু, আমি ওসব গালগল্প বিশ্বাস করি না। বরং আপনি আমায় পথটা বলে দিন, আমি এগোই।"

ভদ্রলোক বিরক্ত মুখে বললেন, "আরে মশাই, পথ বাতলালেই কি চলবে! আমি তো আর আপনাগো একলা ছাইড়া দিতে পারুম না। তার চেয়ে আপনি বরং আমার সঙ্গে আজ রাইতটুকু এইঘরে কাটাইয়া দিন, কাল সক্কালে আপনগো যাইবার বন্দোবস্ত কইরা দিব'খন।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "না না, তার দরকার হবে না। আমি ঠিক চলে যেতে পারব। হাঁটলে বড়জোর একঘণ্টা লাগবে। ও আমি ঠিক পারব।"

এই অদ্ভুত জীবের সঙ্গে রাত কাটানোর আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই।

"না না, অতটা রিস্ক লওয়া ঠিক হইব না। আচ্ছা আমি আপনাগো সঙ্গে একডা পোলা দিতাসি, সে আপনাগো পথ চিনাইয়া পৌঁছিয়ে দিয়া আইসবে।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "বেশ, তাই দিন। আচ্ছা, ছেলেটা বিশ্বাসী তো?"

নিধিরামবাবু হাসলেন, "সেইদিক থেকে এক্কেরে নিশ্চিন্ত থাকেন। আমাগো গাঁয়ের পোলা, খুব বিশ্বাসী।" তারপর গলা তুলে হাঁক দিলেন, "জগাই, অ্যাই ব্যাটাচ্ছেলে জগা।"

চিৎকার শুনে বছর কুড়ি বয়সের এক ছোকরা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তালঢ্যাঙা চেহারা, মিশকালো গায়ের রং। এই হাড়কাঁপানো শীতেও পরনে শুধু একটা আধময়লা গেঞ্জি আর খাটো ধুতি। কোমরে একটা ছেঁড়া চাদর জড়ানো।

নিধিরামবাবু ছেলেটিকে বললেন, "অরে জগা, শোন। এই বাবুটি রামজীবনপুরে বাঁড়ুজ্জেডাক্তারের বাসায় যাইবেন। তুই এনারে পৌঁছিয়ে দিয়া আয় গে।"

ছেলেটি চোখ পিটপিট করে বলল, "আমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে একেবারে বাড়ি চলে যাব। আর ফিরে এসে কী করব?"

নিধিরামবাবু খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললেন, "তুই বাসায় চলি গেলে আমি কি রাতভর একলা ইখানে থাকুম? বদমাশ কোথাকার! শেষ রাতের টেরেনটা কিলিয়ার কইরা তোতে-আমাতে একসঙ্গে বাসায় ফিরুম, বুঝলি? চটপট যা গিয়া অখন। আর শোন, দেরি করবি নে একদম। ওঁকে পৌঁছিয়ে দিয়াই ফিইরা আসবি, বুঝলি?"

আমি নিধিরামবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দু'টো গোলগোল করে বললেন, "সাবধানে যাইবেন, অনেকটা পথ। আর-একটা কথা, বেলতলার পুকুরপাড়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় রামনাম স্মরণ করতে-করতে যাইবেন, কেমন!"

আমি আর জগাই স্টেশনমাস্টারের ঘর ছেড়ে পথে নামলাম। পিচের রাস্তার পরই শুরু হল এবড়োখেবড়ো মেঠোপথ। বাইরে ঠান্ডাটা বেশ, কিন্তু তাতে জগাইয়ের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। সে দিব্যি চুপচাপ টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে চলেছে। পথঘাট অন্ধকার, তাই আমরা কেউ কারওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে-মাঝে দু'-একটা শিয়াল-কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

আমিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলাম, "হ্যাঁ রে জগাই, তোর বাড়ি কোথায়?"

জগাই হাতের টর্চটা ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, "আজ্ঞে বাবু, আমার বাড়ি হরিদেবপুরে।"

"এখান থেকে কদ্দুর?"

"আজ্ঞে, এখান থেকে আধঘণ্টা হাঁটলে হরিদেবপুর পড়বে... হরিদেবপুরের শেষ প্রান্তে আমার বাড়ি। সেখান থেকে আরও একটু এগোলে বেলতলার মাঠ... তারপর পুকুরপাড়ের পাশ দিয়ে সোজা গেলেই রামজীবনপুর শুরু হচ্ছে। নিধিবাবুর বাড়ি ওই রামজীবনপুরে।"

"বাঃ, তোর উচ্চারণে তো বেশ একটা কলকাতার ছাপ আছে!"

"আমি তিন-চার বছর কলকাতায় একটা চায়ের দোকানে কাজ করতাম।"

"তা আবার গাঁয়ে ফিরে এলি কেন?"

"সেবার মায়ের খুব অসুখ হল, তাই আমি কলকাতার কাজ ছেড়ে চলে এলাম।"

"কী হয়েছে তোর মায়ের?"

"সদর হাসপাতালের ডাক্তার তো বললে টিবি। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালে সেরে যাবে।"

"নিয়ে যাসনি মাকে কলকাতায়?"

"সে তো অনেক খরচের ব্যাপার। এত টাকা কোথায় পাব বাবু! বাবাও তো ওই রোগেই বিনে চিকিৎসায় মরে গেল।"

এর পর আর কিছু বলা যায় না। অনেকক্ষণ থেকে একটা কথা জানবার জন্য মনটা উসখুস করছিল। এবার জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা জগাই, নিধিরামবাবু যে বেলতলা না পুকুরপাড়, কোথায় যেন ভূতের উপদ্রব আছে বলছিলেন। তোদের গাঁয়ে কি সত্যি-সত্যি ভূত আছে?"

জগাই হেসে জবাব দিল, "নেই আবার? আমাদের এখানে সবরকম ভূতই পাওয়া যায়। গেছো, মেছো, শাঁকচুন্নি, পেতনি, ব্রেম্ভোদত্যি... সব।"

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, "ধুত! ভূতটুত বলে কিছু আছে নাকি! ওসব বাজে কথা। তুই নিজের চোখে ভূত-প্রেত দেখেছিস কখনও?"

"দেখিনি আবার! সেবার যখন আমাদের পাড়ায় সনাতনের মা ম'ল, তারপর থেকে পরপর তিনরাত সনাতনের মাকে নিমগাছে দোল খেতে দেখেছি।"

"সত্যি তুই দেখেছিস? আমার বাপু বিশ্বাস হয় না। ও তোর চোখের ভুল, কী দেখতে কী দেখেছিস হয়তো।"

"চোখের ভুল হতে যাবে কেন বাবু? তা ছাড়া আমি তো শুধু একাই দেখিনি, আরও অনেকে দেখেছে। সকলেই কি ভুল দেখেছে?"

এই কথার কোনও জবাব আমার কাছে নেই। তবু চুপচাপ হাঁটার চেয়ে ভূতের গল্প শোনাও ভাল। তাই জগাইকে উসকে

গল্প

দেওয়ার জন্য বললাম, "তাও আমার বিশ্বাস হয় না। দ্যাখ, সামনের আষাঢ়ে আমি বিয়াল্লিশে পড়ব, মানে আমার বয়স তোর বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। কই আমি তো সারাজীবনে একখানাও ভূতের টিকি দেখতে পেলাম না!"

"আপনারা বাবু শহরের লোক। আপনারা এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করেন না, সে আমি জানি। তা ছাড়া তেনারা নির্জনে থাকতে ভালবাসেন, শহরের হট্টগোল তেনাদের পছন্দ নয়।"

আমি শুনে মুচকি হাসলাম। অন্ধকারেও বোধ হয় জগাই সেটা টের পেয়ে বলল, "দেখুন, ওই জন্যই বললাম আপনারা শহরের লোক, এ সমস্ত কথা মানতে চাইবেন না।"

তারপর একটু থেমে বলল, "পুবপাড়ার পকাইও সনাতনের মায়ের ভূতের কথা বিশ্বাস করেনি। বলেছিল যে, সে একাই রাতভর নিমগাছের তলায় বসে থেকে দেখবে, সনাতনের মায়ের প্রেত কেমন করে আসে। ব্যস, পরদিন সকালে গাঁয়ের সকলে দেখল যে, পকাই ওই নিমগাছটার তলায় ভয়ে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। সারা শরীর নীল হয়ে গিয়ে চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। শরীরে কোনও সাড় নেই। বেঘোরে বেচারার প্রাণটা গেল।"

আমি সেই একই সুরে আবার বললাম, "তবুও আমার বিশ্বাস হয় না।"

এবার জগা গলার স্বরটা নামিয়ে বলল, "জানেন বাবু, যারা ভূত মানে না, ভূত কিন্তু তাদের ঠিক শায়েস্তা করে।"

"কী করে?"

"ঘাড় মটকে কিংবা ভয় দেখিয়ে, আবার কী করে?"

আমি হাসি চেপে বললাম, "আচ্ছা, তবে ঠিক আছে! আমি তো এখানে দিনকতক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আছি। এর মধ্যে একদিন বরং তুই আমায় খানকয়েক ভূত দেখিয়ে দিস কেমন! দেখাতে পারলে কিন্তু পাঁচশো টাকা বখশিশ পাবি। হাঃ হাঃ...।"

জগা আমার হাসি থামিয়ে দিল। বলল, "একদিন কেন, আজই চলুন না, দেখিয়ে দিচ্ছি। পথেই তো পড়বে। আমাদের বাড়ি ছেড়ে একটু এগোলেই বেলতলার মাঠ, তারপরেই পুকুরপাড়। ওখানে অনেকেই কানুর ভূতকে দেখেছে।"

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, "কানু আবার কে?"

"কানু আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে, লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল, যাকে বলে ইশকুলের ফার্স্টবয়। একবার কী ব্যাপারে যেন ইশকুলের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে তার গোলমাল বাধে। তারই জেরে ইশকুলের সমস্ত মাস্টারমশাই একজোট হয়ে কানুকে শায়েস্তা করার ষড়যন্ত্র করেন। তারপর কানুর নামে বদনাম রটিয়ে পঞ্চায়েতে সকলের সামনে তাকে অপমান করেন। সেই অপমান সইতে না পেরেই কানু হাত-পা বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। তারপর থেকেই কানুর প্রেত..."

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না...", তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, তোর ভূতে ভয় করে না?"

"ওই যে বললাম, যারা ভূত মানে, ভূত তাদের কিচ্ছুটি করে না। আমি তো ভূত মানি, ঠাকুর-দেবতা মানি। আমার আবার ভয় কী?"

আমি চুপ করে গেলাম। জগাই বলল, "এই যে হরিদেবপুর এসে গিয়েছে।"

এই অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা অনেকটা পথ চলে এসেছি। ঘড়িতে টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, আটটা বেজে কুড়ি। এরই মধ্যে যেন জায়গাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া বোধ হয় লোডশেডিং-এর জন্য রাস্তার বাতিগুলোও নিভে রয়েছে। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গ্রামটা পেরিয়ে এলাম। জগাই আঙুল তুলে দূরে একটা বটগাছের পাশে তাদের বাড়িটা দেখাল।

আর-একটু এগোতেই আমরা একটা নেড়া মাঠে এসে পড়লাম। কী আশ্চর্য, এত বড় মাঠ, প্রায় তিন-চারখানা টেনিস কোর্টের সমান অথচ একটাও গাছপালা নেই বললেই চলে। আছে শুধু আগাছা আর দূরে রয়েছে একটা বেলগাছ। প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেয়াল!

জগাই ফিসফিস করে বলল, "এটাই বেলতলার মাঠ। আর-একটু এগোলেই পুকুর। পুকুরের পাড় ধরে সোজা গেলেই একটা ছোট্ট বাঁশবন পড়বে। বাঁশবনটা ডান হাতে রেখে বাঁক ঘুরে সোজা গেলেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশেই ডাক্তারবাবুর পাকাবাড়ি।"

আমি বললাম, "বাঃ! তা হলে তো এসেই গিয়েছি, আর একটুখানি পথ। ওটুকু আমি একাই চলে যাব'খন। তুই বরং স্টেশনে ফিরে যা। এতটা রাস্তা একা ফিরবি, তা ছাড়া রাত হয়ে আসছে, শীতটাও ক্রমশ বাড়ছে।"

আমি পঞ্চাশ টাকা বের করে জগাইয়ের হাতে গুঁজে দিলাম, "এই নে, এটা রাখ। আর দেরি করিস না, ফিরে যা।"

জগাই প্রথমটায় খানিকটা গাঁইগুঁই করল। আমি নাকি একা পথ চিনে যেতে পারব না। এতটা পথ যখন সে এলই, তখন বাকি পথটুকুও চলুক। শেষ পর্যন্ত আমি একরকম জোর করেই ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

বেশ খানিকটা দূরে বুড়ো বেলগাছটা আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে কুয়াশায় সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। আমি একটা সিগারেট বের করে ধরালাম। দেশলাই কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নেভাতেই খেয়াল হল, একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছি। জগাই যাওয়ার সময় ওর থেকে টর্চটা চেয়ে নেওয়া হয়নি। আমার কাছেও দেশলাই ছাড়া আর কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। সত্যি মহাফ্যাসাদে পড়া গেল! এ সমস্ত জায়গায় সাপখোপ থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। আর সাপখোপ না থাক, খানাখন্দ তো রাস্তায় ভর্তি। পথে বেশ কয়েকবার হোঁচট খেয়েছি। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। জগাই যে কোন দিকে উধাও হয়ে গেল, এই অন্ধকারে কিছুই আর ঠাওর করতে পারছি না।

মিনিট কয়েক পর চোখটা অন্ধকারে কিছুটা সয়ে আসায় বেলগাছটা লক্ষ করে হাঁটতে লাগলাম। কিছুটা হাঁটতেই বুঝলাম যে, বুড়ো বেলতলাটা যতটা দূর মনে হয়েছিল আসলে সেটা তার চেয়েও দূরে। হাঁটছি তো হাঁটছি। গা'টা মাঝে-মাঝে কেমন শিরশির করে উঠছে। সেটা

প্রকাশিত হল
শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প ১০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
('মার্কো', 'মেমোরিয়ালের পরী', 'ভাসান যাত্রা', 'শত্তুর', 'আলোর ভাষা' সহ ১৬টি গল্প)
ভূমিকা - শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - বিজন কর্মকার
পটভূমি সমুদ্র ১০০ অস্তি গোদাবরী তীরে ৭০
বন্দরে বন্দরে (বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত) (৬ষ্ঠ সংস্করণ আসন্ন প্রকাশ)
সাহিত্যবিহার ১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট কল-৯ পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোং ৫৬ সূর্য সেন স্ট্রিট কল-৯ ☎ ২২৫০-৪৫৩৪, ২২৫৪-০৭২৮

শীতের জন্য না অন্ধকারে একা হাঁটার জন্য, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। চারদিক নিস্তব্ধ, ধু ধু মাঠে শুধু ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। পিছনে তাকালে অবশ্য অনেকটা দূরে হরিদেবপুরের দু'-একটা বাড়ি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও একটা শিয়াল 'হুক্কা-হুয়া-আ-আ' করে ডেকে উঠল, অমনি আশপাশ থেকে অনেক শিয়াল তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেয়া-হুয়া, কেয়া-হুয়া...'। এই আচমকা শব্দে বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধক করে উঠল, আর অমনই আঙুল থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। নিজেই নিজের উপর একটু বিরক্ত হলাম।

আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটা নেভাতেই পিছন থেকে একটা হুস-হুস শব্দ পেলাম। পিছন ফিরে দেখলাম, কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে হুসহুস করে শিয়াল তাড়াচ্ছে। তারপর একটা ঢিল তুলে ওপাশে ছুড়ে দিল। আমি দু' পা এগিয়ে গিয়ে বললাম, "কে? জগাই নাকি? উফ, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা, ফিরে এলি যে? তোকে যে চলে যেতে বললাম!"

সে এগিয়ে এল, "আপনি যে বললেন ভূত দেখবেন!" অন্ধকারে তার মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

আমি বললাম, "তা ফিরে এসে ভালই করেছিস, যা অন্ধকার! কিন্তু টর্চটা কোথায় ফেলে এলি রে! আর এই চাদরখানাই বা কোত্থেকে জোগাড় করলি?"

জগাই ফিসফিস করে বলল, "বাড়ি গিয়েছিলাম চাদর নিতে, টর্চটা সেখানেই ভুলে ফেলে এসেছি বোধ হয়।"

"আচ্ছা সে যাকগে, এখন চল, আমায় পৌঁছে দিবি চল।"

জগাই আগে-আগে হাঁটতে লাগল, আর আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। অনেকটা হাঁটার পর বেলগাছটার কাছে আসতেই খানিক তফাতে পুকুরটা দেখা গেল, কালো টলটলে জল। এখানেই কানু আত্মহত্যা করেছিল, সেটা ভাবতেই গা'টা কেমন ছমছম করে উঠল। আমি জগাইকে বললাম, "দাঁড়া জগা, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।"

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই ধরাতেই জগাই এগিয়ে এসে মুখটা আমার মুখের কাছে এনে ফিসফিসিয়ে বলল, "আলো নেভান মাস্টারমশাই, না হলে ভূতের দেখা পাবেন না!"

আমি চমকে উঠে জগাইয়ের দিকে তাকালাম। দেশলাইয়ের অল্প আলোয় চাদরের ভিতরে তার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। একটা বীভৎস মুখ। একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, অন্য চোখটার জায়গায় বড় একটা গর্ত। কী ভীষণ দৃশ্য! আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। এ কি তবে কানু? তবে কি সে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ চায়! আমিও তো একজন স্কুলশিক্ষক।

সে এক ফুঁয়ে আমার হাতের দেশলাই কাঠিটা নিভিয়ে দিল। এক মুহূর্তে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরেই শুনতে পেলাম একটা হাড়কাঁপানো বিকট হাসি, "কী মাস্টারমশাই, ভয় করছে নাকি?"

আমার হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। আমি কোনও মতে কয়েক পা পিছিয়ে এলাম। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, চাদর মুড়ি দেওয়া কানুর শরীরটা আমার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর সেটা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে পুকুরে নেমে গেল। পরমুহূর্তেই ঝপাত করে একটা শব্দ হল, আর শুনতে পেলাম সেই বীভৎস হাসি। সঙ্গে 'মাস্টারমশাই' ডাকটাও কয়েকবার কানে এল।

আমার তখন পা টলছে। একবার শুধু সেই বীভৎস মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, আমি বিনোদবাবুর বাড়িতে শুয়ে আছি। আজ আঠাশ তারিখ, অর্থাৎ গত দু' দিন আমি বেহুঁশ ছিলাম। জগাই আমাকে পুকুরঘাটের কাছে পড়ে থাকতে দেখে, বিনোদবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। আমার টাকাপয়সা বা সঙ্গের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি। সত্যি এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব তেমন নেই।

আমি বিনোদবাবুকে বললাম, "আপনাদের খুবই বিব্রত করলাম। আমি আজই ফিরে যেতে চাই। আপনি কাইন্ডলি একটু আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন! আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে একটু জগাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই।"

বিনোদবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তা না হয় হল, কিন্তু তুমি এখন বাড়ি ফিরবে কী! আগে সুস্থ হয়ে ওঠো।"

"কিন্তু আমি তো এখন বেশ ভালই আছি। আমার তো তেমন কিছু..."

"আরে বাবা, তোমার এখনও পাল্‌স নর্মাল হয়নি। তুমি টানা দু' দিন জ্বরে বেহুঁশ ছিলে। আমি নিজে ডাক্তার, আমি তোমাকে বলছি, তোমার এখন কিছুদিন কমপ্লিট রেস্টের দরকার। তুমি বরং তোমার স্কুলে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শীতের ছুটিটা এক্সটেন করে নাও। আর সেই ক'টা দিন আমার এখানেই বিশ্রাম নাও।"

সেদিন সন্ধেয় জগাই এল। এসেই আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে বলল, "বাবু, আমার জন্যই আপনার এত ভোগান্তি!"

জগাইকে অনেক কষ্টে শান্ত করে চুপিচুপি ওর হাতে পঞ্চাশ টাকার দশটা নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, "এটা রেখে দে, মায়ের চিকিৎসা করাস।"

সে হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে রই।

এটা ওর প্রাপ্যই ছিল। আমাকে ভূত দেখানোর ফিজ। ওকে বললাম, "এই ব্যাপারে কাউকে আর কিছু বলিস না, কেমন?"

পরে অবশ্য বিনোদবাবু আমার কাছে কয়েকবার জানতে চেয়েছিলেন যে, সেদিন আমার কী হয়েছিল? কিন্তু আমি তাঁকে সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। তিনি ডাক্তার মানুষ, হয়তো আমার এসব কথা কিছুই বিশ্বাস করবেন না, হেসে উড়িয়ে দেবেন। ঠিক যেমন আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। হয়তো আপনারাও আমার কথা গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন'...!

পুনশ্চ:

গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে গেলে বেশ ভাল হত। একটা নিখুঁত ভূতের গল্প বলা যেত। কিন্তু না..., আমার বিস্ময়ের এখনও আরও বাকি ছিল। সেটুকু না লিখলে গল্পটায় সত্যি একটু খুঁত রয়ে যাবে।

বিনোদবাবুর বাড়ি থেকে ফেরার প্রায় এক বছর পরের ঘটনা।

এক রবিবারের সকাল। ব্রেকফাস্ট সেরে খবরের কাগজ পড়ছি। আজকাল তো কাগজ খুললেই শুধু খুন, জখম আর রাহাজানির খবর। আর না হলে অ্যাক্সিডেন্ট। এই যেমন আজকের কাগজেই লিখেছে, কাল সন্ধেবেলা পার্ক সার্কাসের কাছে এক যুবক রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় মারা গিয়েছে। ধড়ে প্রাণ ছিল, সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত! কিন্তু পথচারীরা কেউ এগিয়ে আসেনি। এই কি আমরা সভ্য দেশের নাগরিক?

এমন সময় বংশী এসে বলল, "বাবু, একটা ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচে।"

ভাবলাম, স্কুলের কোনও ছাত্র এসেছে হয়তো কোনও বিশেষ দরকারে। বললাম, "বসতে বল। যাচ্ছি।"

কাগজটা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে দেখলাম, এক ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে আধময়লা জামাকাপড়। এ আমার কোনও ছাত্র নয়। নিশ্চয়ই পাড়ার কোনও ছোকরা পুজোর চাঁদাটাঁদা চাইতে এসেছে। বংশীটাও না জেনে যাকে-তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয়!

"কী চাই?" গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"আজ্ঞে বাবু, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি জগাই। আগের বছর সেই যে আপনি রামজীবনপুর গিয়েছিলেন, বিনোদডাক্তারের বাড়ি...।"

এবার একটু চেনা-চেনা লাগল। "ও হ্যাঁ... মনে পড়েছে। কী দরকার বল?"

ব্যবহারটা বোধ হয় একটু রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। তাই বললাম, "বোস। চা খাবি?"

সে দু' পাশে ঘাড় নাড়ল।

"এবার বল কী দরকারে এসেছিস? বিনোদবাবু কেমন আছেন?"

"ভাল। ওঁর কাছ থেকেই ঠিকানা জোগাড় করে আপনার কাছে এলাম।"

"ও। আর তোর মা এখন কেমন আছেন?"

"মা এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে। এখন আমি তিলজলার কাছে একটা হাউসিংয়ে কেয়ারটেকারের কাজ করি। মা আর আমি ওখানেই থাকি। আপনার সেদিনের দেওয়া সেই টাকাগুলো না পেলে মাকে বাঁচাতে পারতাম না। এখন যা মাইনে পাই, তাতে দু'টো মানুষের মোটামুটি চলে যায়।"

"বাঃ, খুব ভাল খবর," এর পর আর কী কথা থাকতে পারে, সেটা বুঝতে পারছি না। জগাইও চুপচাপ বসে আছে। কিছু বলছে না। টাকাপয়সা কিছু সাহায্য চাইলে, সে না হয় আরও কয়েকশো টাকা দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এর পর যদি বারবার চাইতে আসে? দেখাই যাক না, কী বলে!

আমি একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, "তুই কি আর কিছু বলবি?"

একটু ইতস্তত করে বলল, "আজ্ঞে বাবু, এটা আপনাকে দিতে এসেছিলাম," জামার বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে জগাই টেবিলে রাখল, "আমি চলে গেলে এটা দেখবেন। আজ তা হলে আসি!"

জগাই উঠে পড়ল।

আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। আমি ভাবছিলাম যে, জগাই কিছু চাইতে এসেছে। কিন্তু উলটে সে আমায় কিছু দিয়ে গেল। কী থাকতে পারে খামটায়? কৌতূহলবশত খামটা তুলে নিলাম। সাধারণ পাতলা, সাদা একটা খাম।

খামটা খুলে দেখলাম, তার ভিতর একটা পাঁচশো টাকার নোট আর-একটা চিঠি। একটু আশ্চর্য হলাম। চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম।

খুব কাঁচা হাতে লেখা, সোজাসাপটা একটা চিঠি। কিন্তু সেটা পড়ার পর আমার মনের যা অবস্থা হল সেটা অবর্ণনীয়। চিঠিটা এখানে তুলে দিলাম।

বাবু,

সেদিন বেলতলার মাঠে আপনি যা দেখেছিলেন, তা সত্যি নয়। পাঁচশো টাকা বখশিশের লোভ আমি সামলাতে পারিনি। মায়ের অসুস্থ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বাবাকে তো আগেই হারিয়েছি। ওই পাঁচশোটা টাকা পেলে মাকেও হয়তো বাঁচাতে পারব। তাই মুখে খানিকটা কাদামাটি মেখে আর কোমরে বাঁধা চাদরটা গায়ে মুড়ি দিয়ে আপনাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিলাম। তারপর একটা আধখানা ইট তুলে পুকুরের জলে ফেলেছিলাম, আর বিচ্ছিরি ভুতুড়ে হাসি হেসেছিলাম। কিন্তু আপনি যে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়বেন, ভাবিনি। আপনার দয়াতেই মা আমার এ যাত্রায় বেঁচে গেল। তাই টাকাটা ফেরত দিয়ে গেলাম। আমায় ক্ষমা করবেন।

ইতি

জগাই

চিঠিটা পড়ে, মাথার ভিতরটা কেমন ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। যেন একটা শব্দ হচ্ছে মাথার ভিতরে। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, ওটা ফোনের রিং। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুললাম। বিনোদবাবু ফোন করেছেন। মাসখানেক হল উনি বাড়িতে ফোন নিয়েছেন। তাই এখন মাঝে-মাঝেই ফোনে কুশল বিনিময় হয়। কিন্তু এত সকালে ফোন করার কী কারণ হতে পারে!

"নিখিল, আজকের কাগজটা পড়েছ?"

"না, এখনও পুরোটা... কেন বলুন তো?"

"থার্ড পেজের মাঝামাঝি, একটা দুর্ঘটনার খবর বেরিয়েছে, দ্যাখো। পার্ক সার্কাসের কাছে এক যুবকের অ্যাক্সিডেন্টের নিউজ়।"

"হ্যাঁ দেখেছি, পুরোটা এখনও পড়া হয়নি। কেন, কী ব্যাপার?"

"আমাদের গ্রামের জগাইকে মনে আছে? সেবারে আমাদের এখানে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, মনে নেই?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। আজ সকালেই তো..."

"হ্যাঁ, আজ সকালেই তোমার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। ও তো এখন কলকাতাতেই থাকে ওর মাকে নিয়ে। দিনকয়েক আগে গ্রামে এসে আমার কাছ থেকে তোমার ঠিকানা নিল। বলল, তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার। আমি বললাম, রবিবার দেখে যেও, তা হলে মাস্টারমশাইকে বাড়িতে পাবে। আজই তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল। কিন্তু আজ সকালেই কাগজে ওর অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা পেয়ে... লিখেছে নাকি, ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেঁচে যেত...। ইস, একটা জলজ্যান্ত তাজা প্রাণ এভাবে...! নিখিল তুমি শুনছ তো? হ্যালো, হ্যালো... নিখিল, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, নিখিল...!

ছবি: অনুপ রায়

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

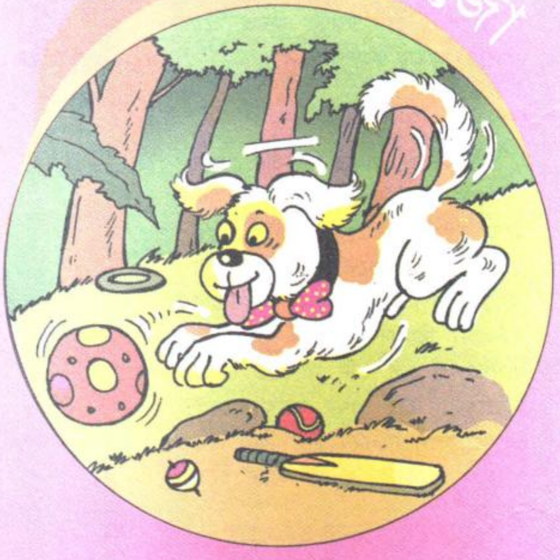

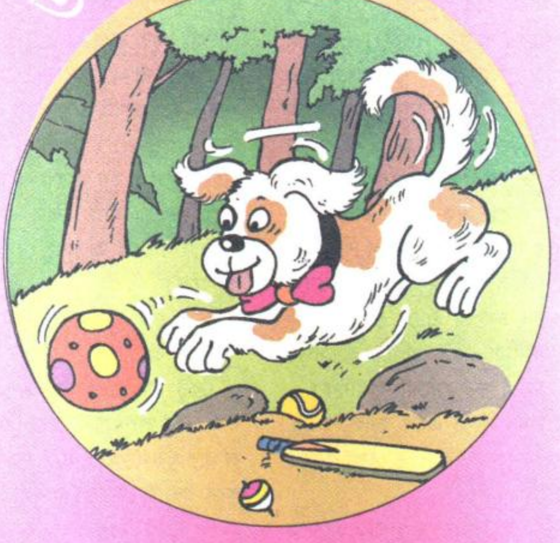

উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

সেদিন ভূগোল ক্লাসে তাতানকে ডেকে ম্যাম বললেন, "তাতান, ওয়ার্ল্ডম্যাপ থেকে উত্তর আমেরিকা খুঁজে বের করো তো!"
তাতান অল্পক্ষণের মধ্যেই খুঁজে বের করে ফেলল। ম্যাম খুব খুশি হলেন এবং ক্লাসের বাকি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা বলো তো আমেরিকা মহাদেশ কে আবিষ্কার করেছেন?"
সমস্ত ক্লাস একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "তাতান।"

বিল্টুদের স্কুলের নিয়ম, কারও খিদে পেলে তাকে কাফেটেরিয়ায় যেতে হবে এবং প্রত্যেকটা খাবারের গায়ে যেমন নির্দেশ দেওয়া থাকবে, তেমনটি করে খাবার নিতে হবে। সেদিন কাফেটেরিয়ায় গিয়ে বিল্টু দেখল, সেখানে কেউ নেই। শুধু খাবারের জায়গায় আপেল রাখা আছে এবং তার গায়ে নোটিস দেওয়া আছে যে, 'একটার বেশি আপেল নিও না। মনে রাখবে কেউ না থাকলেও ভগবান আছেন এবং তিনি লক্ষ রাখছেন।' হঠাৎ বিল্টু খেয়াল করল যে, পাশে একবাক্স চকোলেটও রাখা আছে এবং তার গায়ে কোনও নোটিস লাগানো নেই। বিল্টু গিয়ে তার পাশে লিখে রাখল, 'যত খুশি নিয়ে নাও। ভগবান আপেলের দিকে নজর রাখছেন।'

সেদিন পরীক্ষা দিয়ে এসেই মিতুন সোজা ছুটে ঠাকুরঘরে চলে গেল। মা তো অবাক। কেমন পরীক্ষা হয়েছে, কিছুই না বলে এভাবে ছুটে চলে গেল কেন মেয়েটা! তিনি পিছু-পিছু ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখলেন, মিতুন খুব কাতর গলায় হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুজে বলছে, "প্লিজ় ঠাকুর, মস্কোকে চিনের রাজধানী বানিয়ে দাও!"
মা মিতুনের ভাবগতিক কিছুই বুঝতে পারলেন না। খুব অবাক হয়ে মিতুনের মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? হঠাৎ এরকম আবোলতাবোল বকছিস কেন?"
মিতুন খুব করুণ মুখে বলল, "আরে, আমি তো পরীক্ষার খাতায় তাই লিখে এসেছি।"

জ্যোতি এবং দ্যুতি খুবই বন্ধু এবং দু' জনেই পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। দুপুরবেলা কারও মা-ই কাউকে অন্যের বাড়িতে ছাড়তে চান না। কারণ সেই সময় দু'জনে এত দুষ্টুমি করে যে, সামলানো যায় না। সেদিন দুপুরবেলা দ্যুতি অনেক ভেবেচিন্তে মা'র কাছে গিয়ে বলল, "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" আর বলেই দে ছুট। খেলাধুলো সেরে বাড়ি ফিরতেই মা রেগে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই দুপুরে ওরকম না বলে-কয়ে জ্যোতির বাড়ি চলে গেলি কেন? দ্যুতি মুখ করুণ করে বলল, "বা রে, তুমিই তো বলো, স্কুলে প্রার্থনার সময় যা বলা হয়, সবসময় মেনে চলতে হয়!"
মা খুব অবাক হয়ে বললেন, "হ্যাঁ তা তো ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?"
দ্যুতি একটুও না দমে গিয়ে বলল "স্কুলে তো আমরা সবসময় বলি, তমসো মা জ্যোতির্গময়!"
"মানে?"
"এর মানে তো খুব সোজা। মা, তুমি শুতে যাও, আমি জ্যোতির বাড়ি যাচ্ছি।"

অর্থ শেখো

এবারেও তোমাদের জন্য রয়েছে 'ক' দিয়ে স্বল্প পরিচিত বেশ কিছু শব্দ। আসলে 'ক' দিয়ে শব্দের তো কোনও শেষ নেই! তাই বেশি সংখ্যক শব্দ শিখে রাখলে তোমাদের শব্দভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে। প্রত্যেকটি শব্দের পাশেই আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে।

কটাহ: (১) হাঁড়ি, (২) কলসি, (৩) কড়াই, (৪) তাওয়া।

কঞ্জুসি: (১) না দেওয়া, (২) কৃপণতা, (৩) নীচতা, (৪) ছ্যাঁচড়ামো।

কবরী: (১) এলো কেশ, (২) কেশদাম, (৩) মাথার বেণী, (৪) খোঁপা।

কমবখ্‌ত: (১) হতভাগ্য, (২) হতচ্ছাড়া, (৩) বেচারা, (৪) অভিশপ্ত।

কবুল: (১) মার্জনা, (২) মেনে নেওয়া, (৩) প্রতিশ্রুতি দেওয়া, (৪) অস্বীকার করা।

গত সংখ্যার উত্তর

কন্থা: (৩) কাঁথা। যেমন, 'পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কপর্দক: (৪) কড়ি। যেমন, 'জাবালি কহিলেন, আমার এক কপর্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।' (পরশুরাম)

কাকোদর: (৪) সাপ। যেমন, 'পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে?' (মধুসূদন দত্ত)

কেতন: (৩) পতাকা। যেমন, 'মরুবিজয়ের কেতন ওড়াও।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোদণ্ড: (৪) ধনুক। যেমন, 'কোদণ্ড টঙ্কারসহ অসির ঝনঝনি।' (কবি মধুসূদন দত্ত)।

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

১. কুকুরের জিভ কম বেরিয়ে আছে। ২. কুকুরের লেজের একটি ছোপ নেই। ৩. পিছনের ফ্লায়িং সসারটি নেই। ৪. লাট্টুটা সরে গিয়েছে। ৫. ব্যাটের হাতলটি ছোট। ৬. বলের রং আলাদা। ৭. কুকুরের গলার রিবনের ডিজ়াইন আলাদা। ৮. বাঁ দিকে পিছনের বড় গাছের পাতাটা গাছের পিছনে চলে গিয়েছে।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) মাথার উপর যে বিশাল শূন্য দেখা যায়, গগন। (৩) ছোট, চঞ্চল পাখিবিশেষ। (৫) নাকাল, কাহিল। (৭) পুলিশ কমিশনার, কোটাল। (৯) কথার বা চিঠির উত্তর। (১১) যে আতশবাজিতে উজ্জ্বল, রঙিন ফুলকি বেরোয়। (১৩) এ দেশের বিখ্যাত মহাকাব্য। (১৪) পুত্র, ছেলে। (১৭) অনুপস্থিত। (২০) অতি দরিদ্র। (২১) শক্ত, দৃঢ়। (২২) চুনি, মূল্যবান রত্ন।

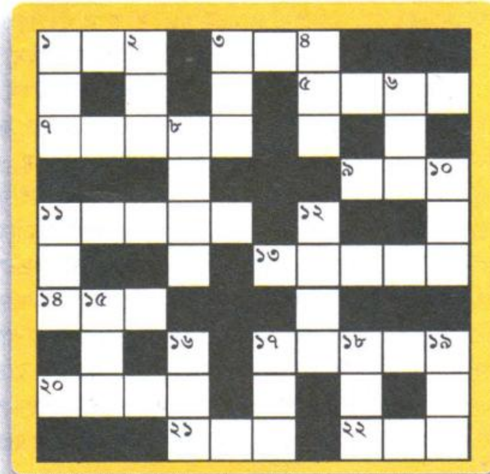

সংকেত: উপর-নীচ

(১) বসার জায়গা। (২) নগর। (৩) চঞ্চল, অস্থির। (৪) দড়ির ফিতেওয়ালা হাফপ্যান্ট। (৬) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। (৮) রান্নার ঘর। (১০) প্রতারিত, পায়নি এমন। (১১) রুপো। (১২) 'হায় হায়' বলে আতর্নাদ। (১৫) পুজোয় চাই — জুতো। (১৬) সোনা। (১৭) যাত্রা, যাওয়া। (১৮) ঝামেলা, দাঙ্গা, মারামারি। (১৯) যে রক্ষাকর্তা।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

		আ	য়ো	জ	ন		প্র	ণা	ম
ম	হে	শ		য়			তা		র
ল্লি		কা	ম	না		অ	প	বা	দ
কা	ম	রা		দ	ম	কা			
	য়ূ		আ			র	সি	দ	
	র	ঙি	ন			ণ		য়া	
			চা	টা	ই		লো	লু	প
ব	ল	বা	ন		তি	ল	ক		স্কি
স		উ			হা		জ	ঙ্গ	ল
ন	ক	ল		বা	স	স্থা	ন		

নানা রঙের রামধনু

ছোট, কিন্তু 'উস্তাদ' তো বটে!

গান গাওয়া এদের দু' জনেরই প্যাশন, বলিউডের এক নম্বর প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হওয়া এদের দু' জনেরই স্বপ্ন! দু' জনে খুব বন্ধুও, আবার দু' জন প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। কারণ, এরা 'আমুল স্টার ভয়েস অফ ইন্ডিয়া ছোটে উস্তাদ'-এর ফাইনালিস্ট অন্বেষা দত্তগুপ্ত এবং ঐশ্বর্য মাজমুদার। ফাইনালের আগে কলকাতা ঘুরে গেল তারা। তাদের সঙ্গে ছিলেন প্রতিযোগিতার তিনজন বিচারক শ্রেয়া ঘোষাল, প্রীতম এবং কুনাল গাঞ্জাওয়ালা। টিভি-পরদার টেনশন ভরা মুড নয়, বরং এই দু' জন ছোট উস্তাদকে কাছে পাওয়া গেল একেবারেই খোলামেলা মেজাজে। এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে তারা খুবই খুশি। ফাইনালে জয়ী হোক বা না হোক, আপাতত দু' জনেরই একটাই লক্ষ্য, প্লে-ব্যাকের দুনিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। বয়সে ছোট হলেও যোগ্যতায় এখনই তারা নামী প্লে-ব্যাক সিঙ্গারদের প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দিতে পারেন, এদের সম্পর্কে এমনটাই মনে করেন তিন বিচারক। এস এম এস ভোটিং শেষ পর্যন্ত যাকেই জয়ের মুকুট পরিয়ে দিক না কেন, বিচারকদের কাছে এরা দু' জনেই 'উইনার'। এখন একটু টেনশনে থাকলেও 'খেলায় তো হার-জিত আছেই', এই ভাবনাটাই অন্বেষা এবং ঐশ্বর্যকে টেনশন মুক্ত রেখেছে ফাইনালের আগে। গান ছাড়া ঐশ্বর্য ভালবাসে নিজের হাতে নানারকম জিনিস তৈরি করতে এবং ছবি আঁকতে। অন্বেষা আবার গল্পের বইয়ের পোকা। তার পছন্দের তালিকায় ফেলুদা, প্রোফেসর শঙ্কু থেকে শুরু করে কাকাবাবু, সকলেই আছেন। কলকাতায় তাদের এই এপিসোডের শুটিংয়ে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ও। সমস্ত কলকাতাবাসীর কাছে তিনি দুই প্রতিযোগীর জন্য ভোটের আবেদন জানিয়েছেন। আপাতত ফাইনালের মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে এই দুই খুদে ওস্তাদ এবং সঙ্গে আমরাও।

অন্বেষা দত্তগুপ্ত

ঐশ্বর্য মাজমুদার

নতুন প্রজন্মের 'ফেমাস ফাইভ'

স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক এনিড ব্লাইটন তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'ফেমাস ফাইভ'-এর প্রথম গল্প 'ফাইভ অন আ ট্রেজার আইল্যান্ড' লিখেছিলেন ১৯৪২ সালে। তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই জর্জ, অ্যান, ডিক, জুলিয়ান ও টিমির নানা অ্যাডভেঞ্চার পড়েছ ও উপভোগ করেছ? পড়তে-পড়তে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে কেন এনিড ব্লাইটন মোটে এই ক'টি গল্প লিখে গেলেন? এই দারুণ চরিত্রগুলো বড় হয়ে কী করল? এখনও বেঁচে থাকলে একবিংশ শতাব্দীতে কেমন অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হত তারা? এই সব প্রশ্নের উত্তর এবার পাওয়া যেতে পারে। জর্জের মেয়ে জো তারই মতো ডানপিটে হয়েছে। অ্যান বড় হয়ে এক সফল আর্ট-ডিলার, অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসায়ী হয়েছিল। তার শপিং-পাগল মেয়ে অ্যালি তারই মতো, বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলতে চায়। ডিকের ছেলে ডিলান ল্যাপটপে শেয়ার বাজারের খবর ঘাঁটাঘাঁটি করে। জুলিয়ানের ছেলে ম্যাক্স অ্যাডভেঞ্চার খুব ভালবাসে। তাদের সঙ্গে এবারও আছে টিমি নামে এক কুকুর। এই সব তথ্য কিন্তু এনিড ব্লাইটনের কোনও অপ্রকাশিত গল্পের বই থেকে পাওয়া যায়নি! আসলে পাঠকরা ফেমাস ফাইভকে ভুলে যেতে পারেনি বলেই ডিজনি চ্যানেল এই নতুন পাঁচকে নিয়ে শুরু করছে এক অ্যানিমেশন সিরিজ।

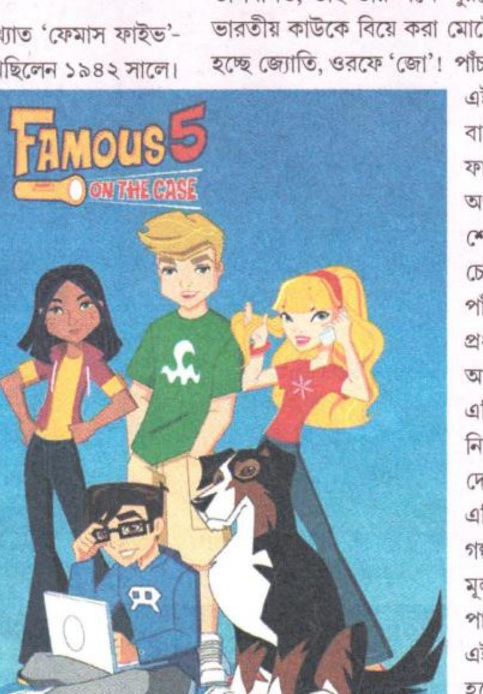

ভারতীয় পাঠকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হল জোয়ের চরিত্রটি। 'জো'-এর পুরো নাম যে জ্যোতি! ডিজনির মনে হয়েছে, যেহেতু জর্জ বেড়াতে খুব ভালবাসত, তাই তার পক্ষে ঘুরতে-ঘুরতে ভারতে এসে পড়া ও তার পর ভারতীয় কাউকে বিয়ে করা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আর তাদের সন্তানই হচ্ছে জ্যোতি, ওরফে 'জো'! পাঁচজনের মধ্যে জোকেই দলনেত্রী বলা চলে। এই পাঁচ ভাইবোন মিলিত হয় জর্জের বাড়িতে। শুরু হয়ে যায় নতুন ফেমাস ফাইভের দুঃসাহসিক নতুন গল্প। অপরাধ ও অপরাধীরাও বর্তমান সময়ের ধাঁচে ফেলা। শোনা গিয়েছে যে, প্রথম গল্পে একদল চোরাচালানকারীদের ধাওয়া করতে-করতে পাঁচজন পৌঁছে যায় দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডে। প্রধান অপরাধী পরিবেশ-সচেতনতার আড়ালে নকল ডিভিডির ব্যবসা করে।

এনিড ব্লাইটনের প্রয়াত কন্যার অনুমতি নিয়েই ডিজনি ফেমাস ফাইভকে নতুন রূপ দেওয়ার কাজে লেগে পড়ে। এর আগেও এনিড ব্লাইটনের সৃষ্ট চরিত্রদের নিয়ে নতুন গল্প লিখেছেন অনেক সাহিত্যিকরাই। কিন্তু মূল গল্পের জনপ্রিয়তাকে টক্কর দিতে পারেননি কেউই। এই নতুন ফেমাস ফাইভ এই প্রজন্মের কাছে আগের মতোই বিখ্যাত হয়ে উঠুক ও এই সুযোগে ব্লাইটনের অদ্বিতীয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি নতুন যুগের পাঠকরা নতুন করে আগ্রহ ফিরে পায়, এই আশা রইল।

নতুন তারকা শ্রীবৎস

কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩০ হাজার ডলারের বিনিময়ে বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্সের হয়েই খেলছেন অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপজয়ী দলের বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি শ্রীবৎস গোস্বামী। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

ক্রিকেটে এলে কীভাবে?

আমি ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলতে ভালবাসতাম। তবে ভবিষ্যতে ক্রিকেটকেই পেশা করে নেব এরকম কোনও ইচ্ছে ছিল না। রোজ বাড স্কুলে পড়ার সময় স্কুল-ক্রিকেট খেলতাম। স্কুলজীবন থেকেই আমি উইকেটকিপিং করতাম। স্কুল-ক্রিকেট খেলার সময় আমি লিলুয়াতে অশোক মালহোত্রর কোচিংয়ে ভর্তি হই। কোচিংয়ে প্র্যাক্টিস করার সময়ই আমার জীবন বদলে যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই আমি অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৪, অনূর্ধ্ব ১৬, প্রায় সব লেভেলেই খেলেছিলাম। তারপর তো অনূর্ধ্ব ১৯ দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে যাই।

ক্রিকেটে তোমার আদর্শ কে?

বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আমার আদর্শ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান-উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। আমি নিজে যেহেতু উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, তাই গিলক্রিস্টের খেলা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সচিন তেন্ডুলকর হলেন আমার আদর্শ এবং সবচেয়ে পছন্দের ক্রিকেটার।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের একজন সদস্য হয়ে কেমন লাগছে? ফাইনালে রান না পাওয়ার ব্যাপারটা ভাবলে এখনও কি খারাপ লাগে?

বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হতে কার না ভাল লাগে! সত্যিই দারুণ লেগেছিল সেদিন। সারারাত আনন্দ করেছিলাম সবাই। আর ফাইনালে রান না পাওয়ার ব্যাপারটা সত্যিই খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ম্যাচ জেতার পর সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম।

অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় দল নিয়ে কিছু বলো...

আমাদের দলের সবচেয়ে বড় সুবিধে ছিল প্রত্যেকের বয়সই কম, তাই মানসিকতাও অনেকটা এক। দারুণ ঐক্য ছিল আমাদের মধ্যে। ছুটির দিনে একসঙ্গে সিনেমা ও শপিং করতে যেতাম। এমনকী মাঠে খেলা চলাকালীনও আমরা এ-ওর সঙ্গে মজা করতে ছাড়িনি। এক কথায় কুয়ালা লামপুর সফরটাই আমাদের দারুণ কেটেছে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সৌরভের নেতৃত্বে তো খেলা হল না! এ নিয়ে তুমি কী বলো?

সৌরভের নেতৃত্বে খেলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বেঙ্গালুরু দল প্রথমেই আমাকে আর বিরাটকে নিয়ে নিল। এ ক্ষেত্রে আমার তো কিছু করার নেই। নিলামে আমার দর উঠেছিল ৩০ হাজার ডলার। আমি একজন পেশাদার ক্রিকেটার এবং যে দলের হয়েই খেলি না কেন, মন দিয়েই খেলব।

জাতীয় ক্রিকেট দলে প্রবীণ এবং নবীনদের মধ্যে কাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত?

আমার তো মনে হয় প্রবীণ ও নবীনদের সংমিশ্রণেই জাতীয় দল গড়া উচিত। কারণ, ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া প্রবীণ ক্রিকেটারদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার থাকে নবীনদের।

ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে?

ক্লাস টুয়েল্‌ভ পাশ করেছি এবং উমেশচন্দ্র কলেজে ভর্তিও হয়েছি। কিন্তু জানি না আর পড়াশোনা করতে পারব কি না। আসলে সারা বছরই তো কোথাও না-কোথাও ক্রিকেট খেলতে হয়। তবে ধ্যানজ্ঞান খেলা হলেও পড়াশোনা শেষ করার ইচ্ছে রয়েছে।

গুড লেংথ

অপ্রতিরোধ্য মাহি

অস্ট্রেলিয়া জয়ের পর ধোনিবাহিনীর সম্বর্ধনা

এখন সময় ক্রিকেটে ভারতের যুবশক্তিকে নিয়ে মেতে ওঠার। লিখেছেন শুভম ঘোষ

বিশ্বকাপের পর কঠিনতম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বলে যাকে ধরা হয়, অস্ট্রেলিয়ার সেই ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয়ে অঘটন ঘটাল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভারত। বেস্ট অফ থ্রি ফাইনালে পন্টিংবাহিনীকে প্রথমে সিডনিতে ৬ উইকেটে, তারপর ব্রিসবেনে ৯ রানে পরাস্ত করে ২-০ ফলে কমনওয়েল্‌থ ব্যাঙ্ক সিরিজ জিতল মাহি বাহিনী। অনবদ্য কৃতিত্ব! আজ্‌হার, সচিন কিংবা সৌরভের মতো হেভিওয়েট নামগুলো যখন এই কাপ জেতাতে পারেননি, তখন অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত রাঁচির তরুণের এই সাফল্য কত বড়? এতদিন একদিনের ক্রিকেটে ভারতের সাফল্য বলতে ছিল ১৯৮৩ সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ এবং ১৯৮৫ সালে সুনীল গাওস্করের নেতৃত্বে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। ২৬ বছর বয়সি ধোনি ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তিকে। গত সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায় টোয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপ জয় করার পাঁচ মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাটিতেই হারালেন তিনি। এই ক্রমাগত উত্থানের ফলে মহেন্দ্র সিংহ এই মুহূর্তে এই গ্রহের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হিসেবে স্বীকৃত। সম্প্রতি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত আই পি এল-এর ক্রিকেটার নিলামে চেন্নাই দলের তরফে ধোনিকে ছ' কোটি টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার ঘটনাই তার প্রমাণ। তবে তামাম দর্শক টিভিতে বা খবরের কাগজে যা প্রত্যক্ষ করে 'সাধু সাধু' করছে, সেটা কিন্তু সেই সফল ধোনির এক বাইরের প্রতিচ্ছবি মাত্র। রুক্ষ বাস্তবে তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে ধোনির নিরন্তর সংগ্রাম থেকে যায় আড়ালেই। যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে দল থেকে বাদ দেওয়া হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাহুল দ্রাবিড়ের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের, তখন দেশজুড়ে হইচই শুরু হয়ে গেল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং অধিনায়ক ধোনির নিন্দায় মুখর হলেন প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটার, সাংবাদিক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বিশেষ রান পাননি, খেলার মাঠে নানা বিতর্কে আবহাওয়া যথেষ্ট গরম, অস্ট্রেলিয়ানদের 'অভব্যতা'কে সকলের অপমান মনে করে সিরিজ বয়কটের ডাকও উঠছে অনেক মহলে। এই অবস্থায় ধোনি জানতেন ব্যর্থতা তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারকেই সঙ্কটে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত সিনিয়রদের বাদ দিয়ে কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারকে দলে নিলেন ধোনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তরুণ, প্রতিভাবান এই খেলোয়াড়রা হতাশ করবেন না। এম এস যে গতানুগতিক ভাবনাচিন্তা করেন না, সেটা টুর্নামেন্ট চলাকালীনও দেখা গিয়েছে বেশ কয়েকবার। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফাইনালে তিনি আচমকা খেলান লেগস্পিনার পীযূষ চাওলাকে, আবার মিডিয়াম পেসার প্রভিনকুমারকে দিয়ে বোলিং শুরুও করান। ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও কোনও নির্দিষ্ট নিয়মের ধার ধারেননি তিনি। তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ক্লিক করেছে দুর্দান্তভাবে। আত্মবিশ্বাস ছাড়াও ধোনির ভাল ক্যাপ্টেন্সির আরও একটি কারণ হচ্ছে, তাঁর ম্যানম্যানেজমেন্ট ক্ষমতা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও এই গুণটি ছিল বলে তিনি এত সফল। হরভজন সিংহকে নিয়ে বিতর্কিত ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে ধোনি যেভাবে পুরো দলের সেরা পারফরমেন্সটা বের করে আনলেন, তাকে কুর্নিশ না করে পারা যায় না। তবে অবাক করেছেন নিন্দুকরা। জেতার আগে ধোনির দলকে পাত্তা না দিয়ে তাঁদের মন্তব্য ছিল, "অভিজ্ঞদের বাদ দিয়ে হবে না। শুধু তারুণ্য দিয়ে হয় না।" আর ধোনিরা জেতার পর তাঁদেরই মুখে শোনা গিয়েছে, "অস্ট্রেলিয়া তো বুড়ো টিম! ওদের নতুন খেলোয়াড় আনতে হবে।" অবশ্য ধোনির তাতে কিছু যায়-আসে না। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে ধোনি পালটা আক্রমণ করেছেন নিন্দুকদের। 'সিনিয়রদের আর একদিনের দলে জায়গা নেই' বলে দিয়েছেন তিনি। আর বলবেনেই বা না কেন? তিনি তো করে দেখিয়েও দিয়েছেন।

আমাদের টিম: শাহরুখ খান, সঙ্গে জন বুকানন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা

গুড লেংথ

কিং খানের সৈন্যবাহিনী

আই পি এল শুরু হওয়ার আগেই খবরের শিরোনামে কলকাতা নাইট রাইডার্স। লিখেছেন পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়

আট দলের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অন্যতম কলকাতা নাইট রাইডার্স। মালিক বলিউডের অবিসংবাদিত 'বাদশা' শাহরুখ খান, জুহি চাওলা এবং জয় মেহতা। খেলোয়াড়দের নিলাম এবং তার সঙ্গে প্রচুর টাকার লেনদেনকে ঘিরে সকলের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল আই পি এল। নিলামপর্বের পর, বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নিয়ে এখন আই পি এলের প্রত্যেকটি দলই আক্ষরিক অর্থে চাঁদের হাট। তা সত্ত্বেও, বলা যেতে পারে, এই মুহূর্তে আই পি এলে সবচেয়ে আলোচিত দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী কোচ জন বুকাননকে নিয়ে জমজমাট সংসার নাইট রাইডার্সদের। দলে রয়েছেন রিকি পন্টিং, ক্রিস গেইল, ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, শোয়েব আখতার, ইশান্ত শর্মা, অজিত আগরকরের মতো খেলোয়াড়। নিজে মালিক হলেও শাহরুখ খান অবশ্য সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর টিমের আসল 'বস' আর কেউ নন, স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। স্পনসরকুলও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত নাইট রাইডার্সদের স্পনসর করতে ইচ্ছুক সংস্থার সংখ্যা ৩৬টি। ২৪ জানুয়ারি টিমটাকে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কেনার পর থেকেই শাহরুখের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে নাইট রাইডার্স। দলটাকে একটা জমকালো চেহারা দিতে খরচের কোনও কমতি রাখছেন না মালিকপক্ষ। টিমের জার্সির ডিজাইন করেছেন মণীশ মালহোত্র, টিম সং 'করব লড়ব জিতব রে'র সুর দিয়েছেন বিশাল-শেখর জুটি। টিমের ম্যাসকট একটা কুঁড়ে বাঘ, নাম 'হুগ লি'। তার প্রিয় খাদ্য আবার বার্গার! নাইট রাইডার্স দলের এখন থেকেই যা হাবভাব, তাতে মনে হচ্ছে ক্রিকেটের মাঠে নয়, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে নামছে! নাইট রাইডার্সদের হেলমেটের মধ্যে রয়েছে ভাইকিং শিরস্ত্রাণের ছোঁয়া! যোদ্ধাদের দুর্জয় সাহস আর জেতার ইচ্ছের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দলের জার্সির রং হয়েছে কালো এবং সোনালি।

কিং খান হঠাৎ বলিউড ছেড়ে ক্রিকেট নিয়ে এত মেতে উঠলেন কেন? কিছুদিন আগেই যাঁরা বলেছিলেন, শাহরুখ নিজের ছবির বাণিজ্যের জন্য ক্রিকেটকে বেছে নিচ্ছেন, নাইট রাইডার্স দলটা কিনে তাঁদেরই কি যোগ্য জবাব দিলেন তিনি? শাহরুখ অবশ্য বলেছেন, দেশের তরুণরাই তাঁর অনুপ্রেরণা এবং তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ক্রিকেটকে। আর পাঁচটা ব্যবসায়ীর মতো ক্রিকেট থেকে প্রচুর টাকা উপার্জন করাই যে তাঁর লক্ষ্য নয়, সেটাও কথাবার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছেন শাহরুখ। তাঁর বক্তব্য, কলকাতা নাইট রাইডার্সের উপার্জিত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ চলে যাবে এই রাজ্যের ফুটবলের উন্নতির জন্য। অনেকে হয়তো নাইট রাইডার্স দলে তারকার প্রাচুর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু আমাদের লক্ষ্মীরতন শুক্ল, রণদেব বসুরা যদি এই বিখ্যাত খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে এসে উপকৃত হন, তা হলে লাভই তো বেশি!

অনেক আশা নিয়ে তৈরি কলকাতা নাইট রাইডার্স কেমন খেলবে তা জানা যাবে ১৮ এপ্রিল থেকে। অধীর আগ্রহে সকলের অপেক্ষা এখন আই পি এলের জন্য!

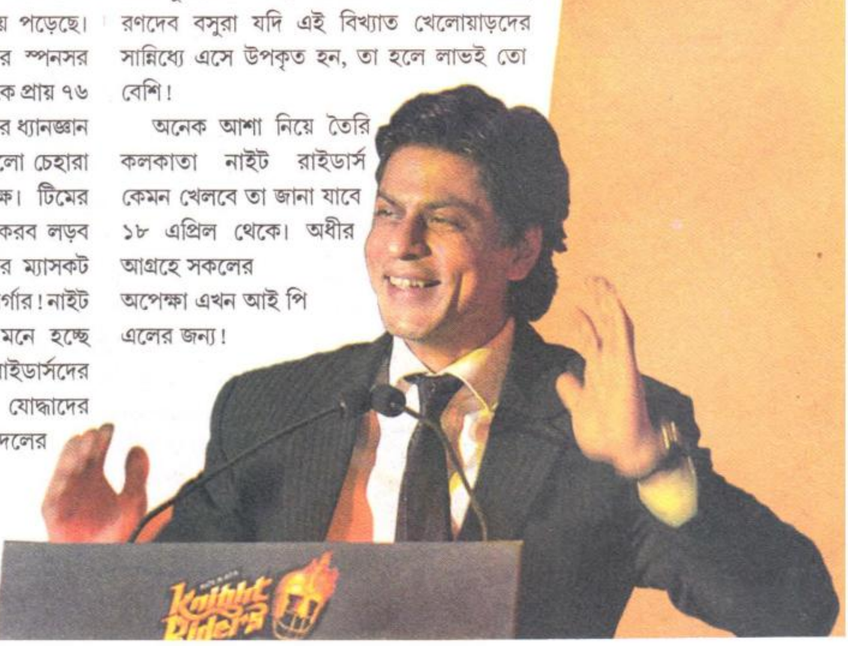

দুঃসময়ে ভারতীয় হকি

এমন দুঃসময় আগে কখনও আসেনি। আসন্ন বেজিং অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলকে খেলতে দেখা যাবে না। ১৯২৮ সালে জয়পাল সিংহের নেতৃত্বে অলিম্পিক হকিতে প্রথম সোনা জিতেছিল ভারত। ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে শেষ সোনাজয়। সব মিলিয়ে আটবার। ভারতীয়দের অলিম্পিকে সোনা জয়ের কৃতিত্ব একমাত্র হকিতেই। সেই হকিই এবার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ। অলিম্পিকের ৮০ বছরের ইতিহাসে হকিতে ভারতের যোগ্যতা হারানো বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বে ব্রাজিলের না খেলার মতোই ঘটনা। চিলির সান্তিয়াগোতে প্রি-অলিম্পিকের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে বেজিং যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ব্রিটেন। আর অন্য দিকে, মুখ নিচু করে দেশে ফিরে এলেন ধ্যানচাঁদ, কে ডি সিংহ বাবু, লেসলি ক্লডিয়াস, গুরুবক্স সিংহদের উত্তরসূরিরা। এই ব্যর্থতা ভারতীয় হকি ফেডারেশনকে এক বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

সুস্মিতার পাশে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড

অস্বাভাবিক মনে হলেও সত্যি! এমন ঘটনা এর আগে ঘটেনি। ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্সে হেপ্টাথলনে সোনাজয়ী অ্যাথলিট সুস্মিতা সিংহ রায়ের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ভোপালে ফেডারেশন কাপে শুধু সোনা জেতাই নয়, হেপ্টাথলনে ৫,৮৬৬ পয়েন্ট তুলে নিয়ে সুস্মিতা যেমন বেজিং অলিম্পিকে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তেমনই হেপ্টাথলনের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন এক নম্বর জায়গায়। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অন্যান্য খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রস্তুতিতে দরকারে আর্থিক সহায়তা দেবে। অলিম্পিকে ভাল ফল করতে হলে সুস্মিতার বিদেশে প্রস্তুতি নিতে যাওয়ার দরকার। শরদ পাওয়ারদের এরকম উদ্যোগ নিশ্চয়ই সুস্মিতাকে আরও বড় স্বপ্নের দিকে এগিয়ে দেবে।

ভারতে সেরেনা আবার চ্যাম্পিয়ন

বেশ কিছুদিন ধরে ট্রোফি জয়ের খরা চলছিল। আন্তর্জাতিক টেনিস সার্কিটে খুব বেশি সুবিধে করতে পারছিলেন না তিনি। অসুস্থতার জন্য এবার বেঙ্গালুরু ওপেনে খেলতে আসতে পারবেন কি না তা নিয়েও ছিল অনিশ্চয়তা। শেষে সব বাধা পেরিয়ে মার্কিন টেনিসকন্যা সেরেনা উইলিয়ামস আবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকা ভারতে প্রথমবার এসেই 'টায়ার-টু ডব্লিউ টি এ' টেনিস খেতাব জিতে নিলেন। বেঙ্গালুরুতে ফাইনালে চতুর্থ বাছাই সুইডেনের প্যাট স্লাইডারকে ৭-৫, ৬-৩ গেমে হারিয়ে তুলে নিলেন সেরার শিরোপা। এর আগে সেমিফাইনালে দিদি ভেনাসকে হারিয়ে দেন তিনি। ১৯৯৮ সাল থেকে টেনিস জগতে দুই বোনের লড়াই চলছে। টেনিসযুদ্ধে দিদিকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন বোন। ১৬ বারের মুখোমুখি লড়াইয়ে সেরেনা ন' বার জিতেছেন। ভেনাস জিতেছেন সাতবার। প্রথমবার ভারতে এসে কেরিয়ারের ২৯তম সিঙ্গল্স খেতাব জয়কে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন সেরেনা।

৩০ লক্ষ টাকায় ইস্টবেঙ্গলে সুব্রত পাল

না, কোনও দুরন্ত গোল বাঁচানোর রেকর্ড নয়। ভারতীয় দলের গোলরক্ষক সুব্রত পাল গড়ে ফেলেছেন অন্য এক রেকর্ড। আই লিগের পরই দলবদলের বাজারে ডেম্পো ২৫ লক্ষ, সালগাঁওকর টিডি সুভাষ ভৌমিক নাকি ৩৫ লক্ষ টাকা দর দিয়েছিলেন সুব্রতর। সঙ্গে ছিল সুব্রতর কোচ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে গোলকিপিং-এর জন্য কোচ করে নেওয়ার অফার। গত বছর মাহিন্দ্রা ইউনাইটেডের সঙ্গে ১৫ লক্ষ টাকায় সর্বাধিক অর্থে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন আর-এক বাঙালি গোলরক্ষক সন্দীপ নন্দী। পুরনো সব হিসেবকেই উলটে দিয়েছেন সুব্রত। দলবদলের টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত পুরনো ক্লাব ইস্টবেঙ্গলেই থেকে গিয়েছেন তিনি। তবে তার জন্য লাল-হলুদ দলের কাছ থেকে সুব্রত ৩০ লক্ষ টাকার বেশি পরিমাণ অর্থ পাবেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন নায়ক

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি টেস্ট দলে সুযোগ পাননি। তবে এর মধ্যেই বোলিংয়ে ভারতীয় দলের হয়ে নজর কেড়ে নিয়েছেন তরুণ প্রবীণ কুমার। বয়স মাত্র ২১। জ্যাঠামশাই জগৎ সিংহ ছিলেন কুস্তিগীর। কাকা আজাদ সিংহ ছিলেন কবাডি খেলোয়াড়। প্রবীণ চলে এসেছেন ক্রিকেটে। ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হয়ে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর বড় অস্ত্র। দু'টি ফাইনালে প্রবীণের বলে ঘায়েল হয়েছেন টানা তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের নেতা রিকি পন্টিং। পরপর তিনটি ম্যাচে দশটি উইকেট। দু'টিতে আবার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী প্রবীণ কুমারকে ১০ লক্ষ টাকার 'কাঁসিরাম ক্রীড়া পুরস্কার'-এ ভূষিত করেছেন।

চন্দন রুদ্র

জুনিয়ার হরলিকস্ 123 TM

পুষ্টি তথ্য

10 জন শিশুর মধ্যে 1 জন* শিশুও
পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ পাতাওয়ালা সব্জী গ্রহণ করে না।

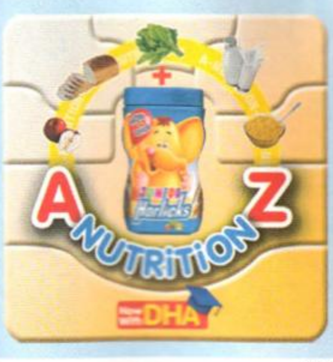

সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি ভিটামিন B2, C, ফলিক অ্যাসিডের মতো ভিটামিন এবং ক্যালশিয়ামের মতো খনিজ পদার্থের ভালো উৎস। তা সত্ত্বেও ছোট বাচ্চারা সেসব খেতে খুব ঝামেলা করে। তাহলে, আপনার বাচ্চার আহারে এই ফাঁক পূরণ করতে আপনি কি করবেন? জুনিয়ার হরলিকস্ এই ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে, তার দৈনন্দিন আহারের অঙ্গ হিসাবে। একমাত্র জুনিয়ার হরলিক্সেই আছে DHA এবং মুখ্য পুষ্টির 100%^ দৈনন্দিন কোটা, যা চূড়ান্ত বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে। বিশেষভাবে ছোট বাচ্চাদের জন্যে তৈরী করা, দৈনন্দিন আহারের সঙ্গে মাত্র 2 কাপ জুনিয়ার হরলিকস্ তার A থেকে Z পুষ্টি™ মেটাতে পারে।

*সূত্র : NNMB 2000, 1-3 বছরের বাচ্চাদের জন্য। • ভিটামিন বি 2, বি 6, বি12, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, আয়রণ এবং ক্যালশিয়াম - ^2 টি পরিবেশনে, US NRC 2001 অনুসারে। • জুনিয়ার হরলিকস্ হল একটি পুষ্টিকর পরিপ দৈনন্দিন সুষম আহারের অঙ্গ হিসাবে আপনার শিশুর পুষ্টি-র প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাহায্য করতে পারে। • এই উৎপাদনটি কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু-র দুধের বিকল্প অথবা 2 বছরের নীচের বাচ্চাদের শিশু আহার নয়।

5197.2C

ANANDAMELA APRIL 2008 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/
MM & PO/SSRM-KOL RMS/RNP-236/LPWP-051/2007-09 RNI NO.27057/75